গাইবান্ধা জেলার মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা ২০১৫

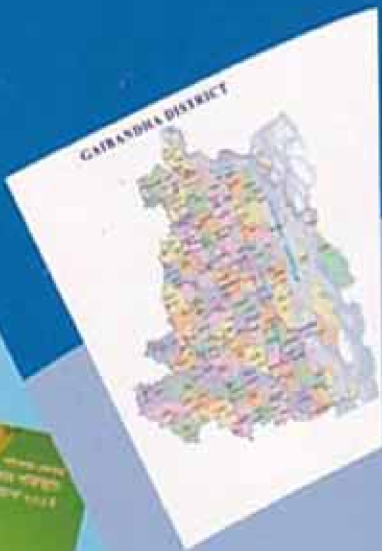

মানবাধিকার ফোরাম

গাইবান্ধা

গাইবান্ধা জেলার মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা-২০১৫

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৫

সম্পাদনা পরিষদ
আবু জাফর সাবু
জহুরুল কাইয়ুম
এম. আবদুস্ সালাম
হাসিনা জোয়ার্দার
আশিক আহমেদ
আফতাব হোসেন

প্রকাশক
মানবাধিকার ফোরাম
গাইবান্ধা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
বিপ্লব দাস অরু
আবু সাঈদ তুহিন

মুদ্রণ
জিইউকে প্রিন্টার্স
গোরস্থান মোড়, ২নং রেল গেইট
গাইবান্ধা।

সচিবালয়

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)
নশরৎপুর, গাইবান্ধা।

প্রাক্‌কথন

মানবাধিকার পর্যালোচনা বিষয়টি অতি জটিল এবং দুরূহ, বিশ্লেষক দৃষ্টিকোণে এই ইস্যুটি মানুষের অধিকার বোধ ও অধিকার আদায়ের সকল ক্ষেত্রে পাওয়া না পাওয়া, চাওয়া না চাওয়া সর্বোপরি তার মানবিক বিকাশের ক্ষেত্রে ন্যায্যতার দাবিটা তুলে ধরে। তদুপরি সেবা পাওয়া বা প্রদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে, সামাজিকভাবে বা অন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উপরও নির্ভর করে। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় নীতি কাঠামো, গণতান্ত্রিক চর্চা ও স্থিতিশীলতা মানবাধিকার সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এতকিছু বিবেচনায় নিয়ে জেলা মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন বিগত (২০১২ এবং ২০১৪) তিন বছর আমরা প্রকাশ করেছি। যদিও আমরা সচেতনভাবে জানি ও বিশ্বাস করি এ প্রকাশনার সাথে আমরা যারা জড়িত তারা জানি, এ দায়িত পালন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও দুরুহ। তারপরও মানবাধিকার কর্মী হিসেবে নিজেকে এবং নিজ পরিসরকে তুলনামূলক পরিশীলিত করার কথা হৃদয়ে নিয়ে কিছুটা বিগত দিনে কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে, পাঠকের এবং সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রেরণা নিয়ে চতুর্থবারের মত পুনরায় গাইবান্ধা জেলার মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা' ২০১৫ প্রকাশ করতে যাচ্ছি।

গতবারের মতই এ বছর প্রতিবেদনে মানবাধিকার রক্ষায়, মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে এবং প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদানে যে সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, যেমন হাসপাতাল, থানা, আদালত, শিক্ষা বিভাগসহ অন্যান্য কিছু প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ তুলে আনা হয়েছে। পাশাপাশি রাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত নতুন ও সংশোধিত ঘোষণানীতি, আইন ও সনদ তুলে এনে ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালের সারা বছরে গাইবান্ধা থেকে প্রকাশিত মানবাধিকার লংঘন জনিত ঘটনাসমূহ তুলে ধরে একটি চিত্র প্রকাশের প্রয়াস চালানো হয়েছে। যা আমাদের সমাজচিত্র বুঝানোর জন্য মোটামুটি একটি ধারনা দেবে। হয়তো এতে অনেক ঘটনা অপ্রকাশিত রয়েছে, যা অনুসন্ধানে আমাদের আরও নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে।

সম্পূর্ণ জেলার চিত্র এটি নয়। আবার বিষয়ের দিক থেকেও এটিকে 'সম্পূর্ণ' দাবি করার কোন সুযোগ নেই। যথারীতি জেলা প্রশাসনের আইন শৃঙ্খলা কমিটি, স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত এবং জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের তথ্যের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য যে অর্থবল, লোকবল ও দক্ষতা প্রয়োজন সেগুলো অর্জন করতে পারলে নিশ্চয়ই প্রতিবেদন পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে।

শুধুমাত্র প্রতিবেদন প্রকাশই নয় জেলা পর্যায়ের সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। প্রতিবেদন প্রকাশ তার একটি অংশ মাত্র। সকলে মিলে চেষ্টা করলে পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি। মানবাধিকার রক্ষায় সরকারের নানা রকম দায়বদ্ধতা রয়েছে। প্রতিবেদনটি আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে পরিস্থিতির দুর্বল অংশ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করলে দায় পূরণে তা অনেক দূর এগিয়ে যাবে তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

আসুন সকলে মিলেই আনি ন্যায় ও সাম্যের পৃথিবী।

আবু জাফর সাবু
আহবায়ক
মানবাধিকার ফোরাম, গাইবান্ধা

কৃতজ্ঞতা

গাইবান্ধা জেলার মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন-২০১৫ প্রকাশিত হলো। ২০১২ সাল থেকে জেলার মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও প্রকাশ হল। মানবাধিকার পরিস্থিতির একটি রূপরেখা প্রণয়নে আমাদের আন্তরিকতার কোন ঘাটতি ছিল না। তারপরও অনেক ত্রুটি থেকে যেতে পারে। যা পাঠক ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ত্রুটি সংশোধনের জন্য এবং আগামীর পর্যালোচনার জন্য সকলের কাছ থেকে মূল্যবান, গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ আমরা প্রত্যাশা করি। এই প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য সরকারি বিভিন্ন দপ্তর এবং প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেন তারা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন গাইবান্ধা মানবাধিকার ফোরাম। ফোরামের সদস্যরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সৎ ও নিষ্ঠার সাথে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ হয়েই করেছেন এই কাজ। এছাড়াও আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এই প্রতিবেদন প্রণয়নে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আইন ও সালিশ কেন্দ্র সহ ফোরামের সকল সংগঠন এবং ব্যক্তির নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে আমাদের প্রত্যয় এবং প্রত্যাশা মানবাধিকার ফোরামের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। মানবাধিকার ফোরামের কার্যক্রম আগামীতে জনগণের কল্যাণ ও মানবাধিকার রক্ষার চর্চায় সবাইকে আন্তরিক হয়ে কাজ করার প্রেরণা যোগাবে।

সচিবালয়ের পক্ষে-

এম. আবদুস্ সালাম
নির্বাহী প্রধান
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)
গাইবান্ধা।

শুভেচ্ছাকথন

নাগরিকরা নিজ অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়ে যখন অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুক্ত হন তখন অধিকারের সুরক্ষা বিধানের কাজটি সহজতর হয়। মানবাধিকারবোধ সম্পন্ন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সচেতন নাগরিক হিসেবে যার যার অবস্থান থেকে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। মানবাধিকার নিয়ে কাজ করতে গেলে নানারকম ঝুঁকি মোকাবেলা করেই এগিয়ে যেতে হয়। এক্ষেত্রে অনেক মানুষের যুক্ততা মানবাধিকার আন্দোলনকে সংগঠিতভাবে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। জেলাভিত্তিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়নকে সেই সংগঠিত আন্দোলনের একটি কার্যকর প্রয়াস বলে মনে করি। আইন ও সালিশ কেন্দ্র-এর সহযোগী সংগঠন গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) এর তত্ত্বাবধানে চতুর্থ বারের মতো গাইবান্ধা জেলা মানবাধিকার ফোরাম এই মানবাধিকার পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। জেলা মানবাধিকার ফোরামের স্বেচ্ছাশ্রমভিত্তিক এই অনন্য ও ধারাবাহিক উদ্যোগকে আন্তরিক স্বাগত জানাই।

এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত দায়-দায়িত্বের বিপরীতে জনগণের সাথে তাদের সেবা আদান-প্রদানের পর্যালোচনামূলক চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদনের তথ্যসূত্র হিসেবে স্থানীয় সংবাদপত্র, জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, জেলা প্রশাসনের আইন-শৃঙ্খলা কমিটি থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও সমস্ত জেলার মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনার সম্পূর্ণ চিত্র নয় এটি, তবুও এই প্রতিবেদন প্রণয়নে যাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে তাদের আন্তরিক উদ্দেশ্যই হলো জেলার সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন। এই প্রতিবেদন প্রণয়ন সেই ধারাবাহিকতার অংশমাত্র, কাজেই এখানে চিহ্নিত সমস্যাসমূহকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে তার উত্তরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রত্যাশিত।

প্রতিবারই প্রতিবেদন প্রণয়নের পর বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, বেসরকারি সংগঠন এবং তৃণমূল ও জাতীয় পর্যায়ের মানবাধিকার কর্মীদের নিয়ে পর্যালোচনা সভা আয়োজন করা হয়, যেখানে আমার উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, পরামর্শ সভাগুলোতে উঠে আসে যার মধ্যে দিয়ে অধিকার সচেতনতা এবং দায়বদ্ধতার বিষয়টি যুগপৎভাবে প্রতিফলিত হয়। এসব বিষয়গুলো আলোচিত হওয়া এবং পরবর্তী প্রতিবেদনে যথাযথভাবে সংযোজিত হওয়া জরুরি। আশা করছি, এবারের প্রতিবেদনে তা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকুক। মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আরও বেশি মানুষ যুক্ত হোক এই প্রত্যাশা রাখি।

ধন্যবাদসহ

সুলতানা কামাল
নির্বাহী পরিচালক
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

সূচিপত্র

প্রতিবেদন প্রণয়নের পদ্ধতি ও ধাপসমূহ ০৬
প্রতিবেদন প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ ০৭
গাইবান্ধা জেলার সংক্ষিপ্ত তথ্য ০৮

পর্ব-এক : রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার

- স্থানীয় সংবাদপত্রের সূত্রে ২০১৫ সালে জেলায় মানবাধিকার লঙ্ঘন/অপরাধের চিত্র ১০
- অনিয়ম ও দুর্নীতি ১৮
- কারাগার পরিস্থিতি ২৪

পর্ব-দুই : অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার

- শিক্ষার অধিকার ও পরিস্থিতি ৩১
- স্বাস্থ্যের অধিকার ৪৪
- সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার ৫৩
- ভোক্তা অধিকার পরিস্থিতি ৬৭

পর্ব-তিন : গোষ্ঠীর অধিকার

- নারীর অধিকার ৭৫
- গাইবান্ধা জেলার দলিত জনগোষ্ঠীর অবস্থান ও অবস্থা ৮৯
- প্রতিবন্ধীদের অধিকার ৯৪

পর্ব-চার : প্রাতিষ্ঠানিক পরিস্থিতি

- বিচার পাওয়ার অধিকার ১০৩
- বিচারে দরিদ্র মানুষের প্রবেশাধিকার ১০৮

মানবাধিকার ফোরামঃ গাইবান্ধা ১১৪

প্রতিবেদন প্রণয়নের পদ্ধতি ও ধাপসমূহ

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) মনে করে এলাকার সমমনা নাগরিক সংগঠন এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ মিলে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করে মানবাধিকার লঙ্ঘনঘটনা প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করলে মানুষের ন্যায় বিচার প্রাপ্তি যেমন সহজ হবে তেমনি বছরে কতগুলি ঘটনার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং তার ফলাফলই বা কি হয়েছে তার ভিত্তিতে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ এবং প্রয়োজনে গণমাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব হবে। এই লক্ষ্যে সমমনা নাগরিক সংগঠন এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ মিলে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এবং একই বিষয়ে পরবর্তী সময় একই বিষয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গাইবান্ধায় কর্মরত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এবং মানবাধিকারভিত্তিক সংগঠনসমূহের অংশগ্রহণ ছিল সভায়।

প্রতিবেদন প্রণয়নের ধাপসমূহ:

- সচিবালয় কর্তৃক ফোরাম সদস্যদের সভা আহ্বান
- প্রতিবেদনের বিষয় নির্ধারণ
- বিষয়ভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন
- তথ্য সংগ্রহের জন্য উপদল গঠন
- পুনরায় সভার মাধ্যমে যাচাই বাছাই সাপেক্ষে চূড়ান্তকরণ
- প্রকাশনা পর্ষদ গঠন
- প্রতিবেদন প্রকাশ

প্রথম সভাতেই ইস্যুগুলো নির্ধারণ করা হয় এবং সেই ইস্যুতে তথ্য সংগ্রহ এবং রিপোর্ট লিখার জন্য সব কমিটি গঠন করে প্রতিটি কমিটির জন্য ১টি ইস্যু নির্ধারণ করে দেয়া হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য কমিটিগুলো স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকা, মিডিয়া, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, বিভিন্ন এনজিও প্রতিবেদন, ইউনিয়ন পরিষদ এর তথ্য কেন্দ্র, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জেলা কারাগার, জেলা আদালত, জেলা ও উপজেলা পরিষদ, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে এবং তাদের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সহায়তায় আজকের এই প্রতিবেদন প্রকাশ সম্ভব হয়।

প্রতিবেদন প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

ক. জেলা পর্যায়ের মানবাধিকার পরিস্থিতির একটি সুনির্দিষ্ট/সম্পূর্ণ চিত্র ধারণ করা।
খ. অপ্রকাশিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলোকে প্রকাশ করা।
গ. জেলা পর্যায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এবং মানবাধিকার রক্ষায় বিভিন্ন কর্মকা-ের তথ্যের সঠিক সংরক্ষণ।
ঘ. প্রশাসনের পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করা বা উদ্বুদ্ধ করা।
ঙ. জেলা পর্যায়ে সমন্বিতভাবে রিপোর্ট প্রকাশের সংস্কৃতি চালু করা।
চ. মানবাধিকার কর্মীদের নিজেদের মধ্যে মানবাধিকার বিষয়ে ধারণার স্বচ্ছতা নিয়ে আসা।
ছ. মানবাধিকার রক্ষায় জেলা পর্যায়ে সরকারি বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি।
জ. জেলা পর্যায় থেকে জনস্বার্থে মামলার ইস্যু চিহ্নিত করা।
ঝ. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকাকে পর্যালোচনায় নিয়ে আসা।

গাইবান্ধা জেলার সংক্ষিপ্ত তথ্য

আয়তন ও অবস্থান: সাতটি উপজেলা নিয়ে গাইবান্ধা জেলা গঠিত। উপজেলাগুলো হচ্ছে– ১. গাইবান্ধা সদর ২. সুন্দরগঞ্জ ৩. সাদুল্যাপুর ৪. পলাশবাড়ী ৫. গোবিন্দগঞ্জ ৬. ফুলছড়ি ও ৭. সাঘাটা। এর আয়তন ২১৭৯.২৭ বর্গ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের উত্তর জনপদ এর গাইবান্ধা জেলা ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদের পশ্চিম তীরে ২৫ ডিগ্রী ৩ ইঞ্চি থেকে ২৫ ডিগ্রী ৩৯ ইঞ্চি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯ ডিগ্রী ১২ ইঞ্চি থেকে ৮৯ ডিগ্রী ৪২ ইঞ্চি পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। সমুদ্র সমতল হতে ২১.৩৫ মিটার উচ্চে গাইবান্ধা জেলা অবস্থিত। গাইবান্ধা জেলার উত্তরে তিস্তা নদী এবং কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলা। উত্তর পশ্চিমে রংপুর জেলার পীরগাছা। পশ্চিমে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর,পীরগঞ্জ উপজেলা ও দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলা। দক্ষিণ পশ্চিমে জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলা। দক্ষিণে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ ও সোনাতলা উপজেলা এবং পূর্ব পার্শ্বে বহমান ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী।

ভূ-প্রকৃতি : ভূ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ পূর্বাংশের কয়েকটি ইউনিয়ন বাদ দিলে প্রায় সমগ্র গাইবান্ধা জেলা 'নবীণ ভূ-তাত্ত্বিক যুগের প্লাবণ সমভূমি'র শ্রেণিভুক্ত। অপরাপরাংশ প্লায়স্টোসিন যুগে সৃষ্ট বরেন্দ্র ভূমির অংশবিশেষ যা স্থানীয়ভাবে 'খিয়ার' এলাকা নামে পরিচিত।

ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : গাইবান্ধা জেলার অধিকাংশ ভূমি নদীবাহিত পলি মাটি দ্বারা গঠিত। গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার 'খিয়ার' অঞ্চলের এঁটেল মাটি ছাড়া প্রায় সমগ্র গাইবান্ধা 'বেলে-দোআঁশ' প্রকৃতির মাটিতে গড়া।

গাইবান্ধার জলবায়ু : এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে, এটা সহজেই অনুমেয় যে, এ অঞ্চলে শীতে প্রচ- শীত এবং গ্রীষ্মে প্রচ- গরম অনুভূত হয়। এছাড়া অন্যান্য ঋতুতে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বিরাজ করে।এ অঞ্চলের জলবায়ু মৌসুমী জলবায়ুর শ্রেণীভুক্ত।

গাইবান্ধা জেলার নদ-নদী : নদীর হৃদয় ফেঁড়ে জন্ম নেয়া গাইবান্ধা জেলার মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকটি নদ-নদী প্রবাহিত হয়েছে। তন্মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম দীর্ঘ নদ ব্রহ্মপুত্রসহ করতোয়া, তিস্তা, ঘাঘট, মানস্ ও বাঙালি নদীর নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ : গাইবান্ধা জেলা বিশেষতঃ তিন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয় :

বন্যা : ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় সেই ১৭৮৭ সাল থেকে গাইবান্ধা জেলা প্রায় প্রতিবছরই বন্যার শিকার হচ্ছে। বলতে গেলে প্রতি বছরই গাইবান্ধা জেলার অন্ততপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ এলাকাই প্লাবিত হয়। ফলে এ অঞ্চলের সম্ভাবনাময় কৃষি বার বার স্তব্ধ হয়ে যায়। রুদ্ধ হয়ে যায় স্বনির্ভরতা অর্জনের গতিপথ।

খরা : ইতিহাস থেকে জানা যায়- ১৭৬৮ সাল থেকে বিভিন্ন সময় শতাধিকবার গাইবান্ধা জেলা ভয়ানক খরার কবলে পড়েছে। খরা দুর্যোগ এতদাঞ্চলের কৃষিকে দারুণভাবে ব্যাহত করেছে। এছাড়াও কোন কোন বছরের অনাবৃষ্টিই চরাঞ্চলে খরাতে রূপ নেয়।

সাময়িক বেকারত্ব: সাময়িক বেকারত্ব বৃহত্তর রংপুর, কুড়িগ্রামসহ প্রায় সমগ্র উত্তরাঞ্চলে জন্য একটি বড় দুর্যোগ। গাইবান্ধাও এ দুর্যোগের শিকার। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর এ তিন মাস কৃষক এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষের কোন কাজ থাকে না। ফলে সৃষ্টি হয় ছদ্ম বেকারত্বের। এর ফলে গচ্ছিত অর্থ ও খাদ্য শেষ হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় সাময়িক খাদ্য সংকটের।

নদীভাঙ্গন : নদীভাঙ্গন গাইবান্ধা জেলার প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের অন্যতম। প্রতিবছর ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ক্রমশই ধেয়ে আসছে গাইবান্ধা শহরের দিকে। জেলার সাঘাটা, গাইবান্ধা সদর, ফুলছড়ি ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় অর্ধশত পয়েন্টে কমবেশি নদীভাঙ্গন চলছে। এতে গড়ে প্রতিবছর ৪-৫ হাজার মানুষ তাদের বসতভিটা জমি-জমা হারিয়ে বিভিন্নস্থানে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে।

পর্ব-এক

রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার

০১. স্থানীয় সংবাদপত্রের সূত্রে ২০১৫ সালে জেলায় মানবাধিকার লঙ্ঘন/অপরাধের চিত্র

০২. অনিয়ম ও দুর্নীতি

০৩. কারাগার পরিস্থিতি

স্থানীয় সংবাদপত্রের সূত্রে ২০১৫ সালে জেলায় মানবাধিকার লঙ্ঘন/অপরাধের চিত্র

দেশের অভ্যন্তরে সংবিধান ও প্রচলিত আইনের মধ্যে থেকে আইন শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখার দায়িত্ব পালন করে থাকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। এই বাহিনীগুলোর ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সাংবিধানিকভাবে খুবই সুনির্দিষ্ট ও স্বীকৃত থাকা সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত একজন বিচারপ্রার্থী অথবা ব্যক্তির মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। আমরা জানি যে, অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন এক বিষয় নয়। এই দুইয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ব্যক্তি ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয় কিংবা উপযুক্ত আদালত থেকে বিচার পায় না কিংবা অনবরত ব্যক্তির উপর অপরাধ সংঘটিত হতে থাকে বা হওয়ার আশঙ্কা জন্মায় তখন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। রাষ্ট্র কিংবা সমাজ থেকে অপরাধ দূর করা সম্ভব নয় কিন্তু সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এজন্য দরকার আইনের শাসন ও পারিবারিক ও সামাজিক সুশিক্ষা। যখন একজন অপরাধী আইনের আওতায় আসে না নানা কারণে, তখন সে আরো অপরাধ করতে উৎসাহী হয়। আর এভাবেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা জন্মে থাকে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে বিচার ব্যবস্থার অধিকতর কার্যকর রাখা অর্থাৎ কারো বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের প্রতিকার বিধান করা, অন্যায় আক্রমণ থেকে রক্ষা করা এবং শঙ্কামুক্ত রাখা।

অপরাধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের কারণেই আমরা প্রথমে অপরাধ চিত্র উপস্থাপন করছি। কারণ একটি এলাকায় নিয়মিত অপরাধ ঘটতে থাকার মানে হল ঐ এলাকার মানুষের আশঙ্কার মধ্যে বসবাস এবং সেই আশঙ্কা মানবাধিকার লঙ্ঘন।

হত্যা/মৃত্যু

২০১৫ সালে গাইবান্ধা জেলার হত্যা/মৃত্যুর চিত্র (স্থানীয় পত্রিকা সূত্রে)

ইস্যু	ধরন অনুযায়ী সংখ্যা		উপজেলা অনুযায়ী সংখ্যা	মোট সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত	
					নারী	পুরুষ
হত্যা/মৃত্যু	সংঘর্ষে/মারপিটে মৃত্যু	০৭	গোবিন্দগঞ্জ-১৫	৩১	১০	২১
	অজ্ঞাত কারণে মৃত্যু	০৭	সুন্দরগঞ্জ-০৫			
	দুর্ঘটনায় মৃত্যু	০৩	গাইবান্ধা সদর-০৩			
	শ্বাসরোধে হত্যা	০৪	সাদুল্যাপুর-০৬			
	অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু	০৫	পলাশবাড়ী-০২			
	নির্যাতনে মৃত্যু	০২				
	পুড়িয়ে হত্যা	০১				
	ধর্ষণের পর হত্যা	০২				

আত্মহত্যা

২০১৫ সালে গাইবান্ধা জেলার আত্মহত্যার চিত্র (স্থানীয় পত্রিকা সূত্রে)

ইস্যু	ধরন অনুযায়ী সংখ্যা		উপজেলা অনুযায়ী সংখ্যা	মোট সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত	
					নারী	পুরুষ
আত্মহত্যা	ফাঁস দিয়ে	১২	সুন্দরগঞ্জ-০৯	১৮	১২	০৬
	বিষপানে	০৬	গোবিন্দগঞ্জ-০৭			
			সাদুল্যাপুর-০২			

উপরোক্ত ছকের তথ্যানুযায়ী দেখা যাচ্ছে গাইবান্ধা জেলার ২০১৫ সালে মোট ১৮টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে ১২ জন নারী এবং ০৬ জন পুরুষ আত্মহত্যা করেছে। উপজেলা হিসাব অনুযায়ী সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় সর্বোচ্চ ০৯টি আত্মহত্যার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নারীদের আত্মহত্যার পিছনেও সমাজ ব্যবস্থা দায়ী। সামাজিক কারণে নারীরা নানাভাবে নির্যাতিত হয়। নির্যাতিত নারীরা পরিবারিক, সামাজিক নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আত্মহত্যা হচ্ছে নিজেই নিজেকে হত্যা করে অস্বাভাবিক মৃত্যুকে বরণ করা। মানুষ

ক্ষোভ, ঘৃণা, লজ্জা, পরাজয় এবং অতিরিক্ত জেদের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে নিজের অথবা অন্যের প্ররোচনায় বিষপান, ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে থাকে। বাংলাদেশে আত্মহত্যা প্রতিরোধে আইন রয়েছে কিন্তু প্রয়োগ নেই। বাংলাদেশ দ-বিধি ৩০৫, ২০৬ এবং ২০৯ ধারায় আত্মহত্যার প্ররোচনাকারীর এবং চেষ্টাকারীর বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান রয়েছে। তদুপরি নারী নির্যাতন দমন আইন-২০০০ (সংশোধনী-২০০৩) এর ৯(ক) এবং ১০ ধারারও আত্মহত্যার প্ররোচনাকারীর শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে। গত ২২ ডিসেম্বর ১০১৫ 'দৈনিক ঘাঘট' পত্রিকায় প্রকাশিত 'গোবিন্দগঞ্জে দুই সন্তানের জননী বিষপানে আত্মহত্যা' শীর্ষক সংবাদ শিরোনামের ঘটনাটি ছিল এমন–

গোবিন্দগঞ্জে সুলতানা বেগম (২৬) নামের দুই সন্তানের জননী এক গৃহবধু বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। জানা গেছে, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নের গোপালপুর (চাঁদগোনা) গ্রামের আবুল কালামের ছেলে আলাউদ্দিন (২৮) এর সাথে ৭/৮ বছর আগে একই গ্রামের সাইদুর রহমান প্রধানের মেয়ে সুলতানা বেগমের বিয়ে হয়। সাংসারিক জীবনে তাদের ২ জন সন্তান রয়েছে। অভাবের সংসারে আলাউদ্দিন ও সুলতানার মধ্যে পারিবারিক ছোট-খাটো বিভিন্ন বিষয়ে প্রায়ই ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকতো। এরই এক পর্যায়ে গত রোববার সন্ধ্যায় তাদের মধ্যে আবারো ঝগড়া হয়। ওই রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে বাড়ির লোকজন ঘুমিয়ে পড়লে অভিমান করে সবার অজান্তে রাতের যে কোন সময় সুলতানা বিষপানে আত্মহত্যা করে। খবর পেয়ে গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম এবং এসআই ইসমাইল হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে সুলতানার লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য গাইবান্ধা মর্গে প্রেরণ করেন। গৃহবধু সুলতানা বিষপানে আত্মহত্যা করে থাকতে পারে বলে পুলিশের প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে। এ ঘটনায় নিহত সুলতানার বড় ভাই শাহীন প্রধান বাদী হয়ে গোবিন্দগঞ্জ থানায় একটি ইউডি মামলা দায়ের করেছে। তবে গৃহবধু সুলতানা আত্মহত্যা করেছে-না তাকে হত্যা করা হয়েছে এ নিয়ে ওই এলাকার জনমনে নানা আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

একজন ব্যক্তির মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে তার কাছে অন্যের অধিকার গৌণ হয়ে পড়ে। সেই বিবেচনায় সংখ্যা দিয়ে বিচারের চেয়ে সমাজে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রভাব পর্যালোচনা করা বেশি জরুরি। সংখ্যা দিয়ে হয়তোবা এর ভয়াবহতা নির্ণয় করা যায় কিন্তু সংখ্যা বিবেচনা মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কাকে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে স্বীকৃতি দেয় না। যদিও সার্বক্ষণিক আশঙ্কায় বসবাস মানবাধিকার লঙ্ঘন।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে খুবই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী ব্যতীত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে এবং আরো বলা আছে, আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি, স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

তাছাড়া ৩৩নং অনুচ্ছেদের ১নং ধারায় বলা আছে 'গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথা সম্ভব শীঘ্রই গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাহার দ্বারা আত্মপক্ষের সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।' একই অনুচ্ছেদের ২নং ধারায় বলা আছে, 'গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক রাখা যাবে না।' সংবিধানের এসব বিধান সমুন্নত রাখার সরকারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ মানবাধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক সনদেও স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। আন্তর্জাতিক আইনের বিধান অনুসারে কোন অবস্থাতেই এই অধিকারকে প্রত্যাহার করা যায় না, এমনকি সামরিক বা জরুরি অবস্থাতেও না।

সংবাদপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং রিপোর্টগুলো পড়তে গিয়ে আমরা দেখেছি গাইবান্ধা জেলার জনসাধারণ মানবাধিকার বিষয়টি সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত নয়। তাছাড়া, সংঘটিত প্রতিটি অভিযোগই যে আবার মানবাধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট তাও নয়। সংগঠিত অপরাধসমূহ থেকে আমরা অপরাধের কিছু দিক, প্রবণতা, ধারা এবং কারণ চিহ্নিত করতে পারি। তাছাড়া এই অপরাধের কিছু সামাজিক প্রভাবও রয়েছে যা জনসাধারণের সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন যাপনকে হুমকির সম্মুখীন করে তোলে অথবা একটা সংকটের মধ্যে ঠেলে দেয়। হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ ও হামলার অপরাধসমূহ সংগঠনের হার যত বাড়বে একটা সমাজে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর নির্ভরতার হার তত বেশি হ্রাস পাবে এবং মানুষজন প্রতিনিয়ত নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্কে ভুগবে। যার ফলশ্রুতিতে এক ধরণের সামাজিক অস্থিরতা ও অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে যা কারও কাছে কাম্য নয়।

জমি সংক্রান্ত নানা ধরনের বিরোধ

গাইবান্ধা জেলায় জমি জমা সংক্রান্ত নানা ধরনের বিরোধ এর ঘটনা ঘটেছে ২০১৫ সালে। এক্ষেত্রে মামলা হামলার ঘটনাও ঘটেছে অনেক। জমি সংক্রান্ত বিরোধ এর জের ধরে হত্যার ঘটনাও জেলায় সংঘটিত হতে দেখা গেছে। জমি সংক্রান্ত বিরোধ-এর জের ধরে নারীরাও হত্যার শিকার হয়েছে। এমনকি প্রতিবন্ধী পরিবারের উপরও জমি জমা সংক্রান্ত হামলা হয়েছে। গত ১২ আগস্ট ২০১৫ তারিখে 'দৈনিক ঘাঘট' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাঘাটায় জমি নিয়ে বিরোধের জের ॥ মা মেয়েকে গাছের সাথে বেঁধে রেখে নির্যাতনের মামলার বাদিকে হুমকি' শীর্ষক সংবাদ শিরোনামের ঘটনাটি ছিল এমন–

গাছের সাথে বেঁধে রেখে নির্যাতনের মামলা দায়ের করার পর থেকে সাঘাটা উপজেলার মোংলার পাড়া গ্রামের রাহেনা বেওয়া, তার মেয়ে শাপলা (২৮) সহ পরিবারের লোকজন নিজের বাড়ি ঘর ছেড়ে আসামীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আসামীরা মা মেয়েসহ পরিবারের লোকজনকে ধরতে পেলে জীবনে শেষ করে ফেলবে মর্মে হুমকি অব্যাহত রেখেছে। জীবনের নিরাপত্তাহীনতার কারণে রাহেনা বেওয়ার ছেলে সিদ্দিক হোসেন আদালতে ১০৭/১১৭ (সি) ধারা মোতাবেক গত ০৯-০৮-২০১৫ইং তারিখে আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। উল্লেখ্য উক্ত মোংলার পাড়া গ্রামের মৃত ঘেরু শেখের পুত্র হাবিজার রহমান (৬৫) প্রতিবেশী মৃত ছাইদুর রহমানের স্ত্রী বিধবা রাহেনা বেওয়া বিভিন্ন স্থানে লোকজনের বাড়িতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। রাহেনা বেওয়া ও তার পরিবারের লোকজন বাড়িতে না থাকায় তার নামে রেকর্ডভুক্ত দখলীয় .২৫০ শতাংশ জমিতে ২২-০৭-২০১৫ইং তারিখে জোরপূর্বক দখল করে ঘর উঠায়। সংবাদ পেয়ে রাহেনা বেওয়া ও তার মেয়ে শাপলা (২৮) গত ০৩-০৮-২০১৫ইং তারিখে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাবিজার রহমানের কাছে ঘর উঠানোর বিষয় জানতে চাইলে হাবিজার রহমান ও তার লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে রাহেনা ও তার মেয়ে শাপলাকে গাছের সাথে বেঁধে রেখে বিভিন্নভাবে শারীরিক নির্যাতন চালায়। এসময় তাদের আত্মচিৎকারে প্রতিবেশী লোকজন তাদেরকে উদ্ধার করে সাঘাটা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। এ ব্যাপারে রাহেনা বেওয়া বাদী হয়ে ৮ জনকে আসামী করে গত ০৫-০৮-২০১৫ইং তারিখে সাঘাটা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

২০১৫ সালে গাইবান্ধা জেলার জমি সংক্রান্ত বিরোধের চিত্র (স্থানীয় পত্রিকা সূত্রে):

ইস্যু	ধরণ অনুযায়ী সংখ্যা		উপজেলা অনুযায়ী সংখ্যা	মোট সংখ্যা
জমি সংক্রান্ত বিরোধ	জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে নিহত	০৪	সাঘাটা-০৫	৩৩
	জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ/ভাংচুর	২১	গোবিন্দগঞ্জ-০৭	
	জমি দখল/দখলের চেষ্টা	০৪	সুন্দরগঞ্জ-০৫	
	জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে অগ্নিসংযোগ	০২	গাইবান্ধা সদর-০৫	
	জমি থেকে ধান কেটে নেয়া	০২	সাদুল্ল্যাপুর-১০	
			ফুলছড়ি-০১	

জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী ২০১৫ সালের মামলার বিবরণ–

ডাকাতি	দস্যুতা	সিঁধেল চুরি	গবাদি পশু চুরি	তার চুরি	গাড়ী চুরি মোটর সাইকেল	অন্যান্য চুরি	খুন	মাদকদ্রব্য	চোরাচালান	অস্ত্র আইন	দ্রুতবিচার	নারী নির্যাতন	ধর্ষণ	অপহরণ	এসিড	অগ্নি সংযোগ	শিশু-নির্যাতন	অন্যান্য
৩	৯	১১	৮	১	১২	২৩	৫৫	২০২	৯৮	২	১০	২৪৪	৭৯	৬	২	১২৮৮	১	১১৭০

উপরোক্ত তথ্যের সাথে সংবাদপত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যেও পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জেলায় ঘটে যাওয়া নানা ধরনের অপরাধের পুরোচিত্র সংবাদপত্রে উঠে আসে না। কিন্তু প্রশাসনের নিকট তথ্যগুলো অনেক বেশি সংরক্ষিত থাকে। জেলার আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভাগুলোতে জেলার সংঘটিত অপরাধের চিত্র অনেকাংশে উঠে আসলেও এগুলো সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রকাশের কোন ব্যবস্থা প্রশাসন এর পক্ষ থেকে নেওয়া হয়না। আবার পত্রিকায় উঠে আসা ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরবর্তীতে কোন ফলোআপ প্রতিবেদন প্রকাশ হয়না। সংবাদপত্রে উঠে আসা ঘটনাগুলোতে মামলা হয়েছে কি-না বা আসামি গ্রেফতার হয়েছে কি-না এ ধরণের দুই একটি তথ্য উঠে আসে। আসামি গ্রেফতার হলে পরবর্তিতে তার শাস্তি হয়েছে কি-না বা আসামি গ্রেফতার না হলে এক্ষেত্রে প্রশাসন কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেগুলো পত্রিকায় উঠে আসে না। প্রশাসনও সংবাদপত্রকে বা সাধারণ জনগণকে জানানোর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে না। অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও এইসব ব্যাপারে প্রশাসনের পদক্ষেপগুলো সংবাদপত্রে আসেনা।

মানবধিকার পরিস্থিতি শুধুমাত্র মানবাধিকার লঙ্ঘন বা অপরাধ সংঘটনের চিত্র বা এর পর্যালোচনা করলেই প্রকাশ পায় না, মানবাধিকার মানুষের প্রত্যহ মৌলিক চাহিদাগুলো পাওয়া না পাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি মৌলিক চাহিদাগুলোও সন্নিবেশিত হয়েছে। নির্বাচনের আগে প্রতি দলেরই ইশতেহারে মৌলিক অধিকার রক্ষার পাশাপাশি মৌলিক চাহিদা পূরণের আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু নিবার্চনের পর তা সবাই ভুলে যান। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে পরবর্তীতে বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী গাইবান্ধা জেলার ২০১৪-২০১৫ সালের অপরাধের তুলনামূলক চিত্রঃ

মাসের নাম	অপরাধ ২০১৪	অপরাধ ২০১৫	আধিক্য (+ -)
জানুয়ারি	২২১	১৮৫	৩৬ (-)
ফেব্রুয়ারি	১৮২	১৪৩	৩৯ (-)
মার্চ	২১৬	১৮৬	৩০ (-)
এপ্রিল	২৪১	১৮৮	৫৩ (-)
মে	২২৫	২২০	০৫ (-)
জুন	২৩৫	২০৪	৩১ (-)
জুলাই	২৪১	২৩০	১১ (-)
আগষ্ট	২৩৭	২০৩	৩৪ (-)
সেপ্টেম্বর	১৯৭	১৯৮	০১ (+)
অক্টোবর	২১২	২২৭	১৫ (+)
নভেম্বর	১৮২	২১৬	৩৪ (+)
সর্বমোট=	**২৩৮৯**	**২২০০**	**১৮৯ (-)**

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে বুঝা যায় ২০১৪ সালের আইন-শৃঙ্খলা কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট অপরাধের সংখ্যা ছিল ২৩৮৯ যা ২০১৫ সালে কমে ২২০০-এ দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ এ বছর ১৮৯টি অপরাধ গত বছরের তুলনায় কম সংঘটিত হয়েছে।

একনজরে গাইবান্ধা জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির ২০১৫ ইং সালে মাসিক সভার প্রতিবেদন অনুযায়ী হত্যার চিত্র নিম্নরূপঃ

ইস্যু	মাসের নাম	হত্যা/খুনের সংখ্যা ২০১৪	হত্যা/খুনের সংখ্যা ২০১৫	আধিক্য (+-)
হত্যা/ খুন	জানুয়ারি	০৬	০৪	০২(-)
	ফেব্রুয়ারি	০৬	০৬	০০(=)
	মার্চ	০৫	০৩	০২(-)

	এপ্রিল	০২	০৫	০৩(+)
	মে	০৫	০৫	০০(=)
	জুন	০১	০৪	০৩(+)
	জুলাই	০৮	১৩	০৫(+)
	আগষ্ট	০৬	০১	০৫(-)
	সেপ্টেম্বর	০৭	০৪	০৩(-)
	অক্টোবর	০৭	০৩	০৪(-)
	নভেম্বর	০১	০৭	০৬(+)
	সর্বমোট	৫৪	৫৫	০১(+)

উপরে উল্লেখিত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জানুয়ারি থেকে নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত মোট হত্যার সংখ্যা ৫৫টি এবং প্রত্যেক মাসেই গাইবান্ধা জেলায় হত্যাকা-ের মত জঘন্য ঘটনা ঘটেছে। ফেব্রুয়ারি, জুলাই ও নভেম্বর মাসে হত্যাকা-ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এছাড়াও অন্যান্য মাসেও হত্যাকা-ের ঘটনা ঘটছে। বিভিন্ন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষকারী বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রদান করলেও হত্যাকা-ের মত জঘন্য ঘটনা বেড়েই চলেছে যা মানবাধিকারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অধিকার জীবনের অধিকারকে খর্ব করেই চলেছে। এসব হত্যাকা-ের বিপরীতে মামলা দায়ের হয় ঠিকই কিন্তু মামলা খুবই ধীরগতিতে চলে। অনেক সময় মামলা তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে বেশ সময় লেগে যায়, এতে করে বাদীপক্ষ মামলা চালানোর ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ করে কিংবা প্রভাবশালী বা রাজনৈতিক নেতাদের চাপে আপোষ মীমাংসা করে ফেলে। চাঞ্চল্যকর কিছু হত্যাকা- ছাড়া বাকি হত্যাকা-ের মামলাগুলোর বিচারপ্রক্রিয়া খুবই সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এসব ঘটনাগুলো সবসময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। আবার যেসব ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় দু-একটা ছাড়া বাকিগুলোর ফলোআপ ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না বিধায় পরবর্তী সময়ে আমরা ঘটনার আপডেট জানতে পারি না।

মাদক সমস্যা

মাদকাসক্তি একটি ক্রমপ্রসারমান, বহুমাত্রিক, জটিল ও দুরারোগ্য সামাজিক সমস্যা। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার গোটা মানব সভ্যতার জন্য এক ভয়বহ সংকট ডেকে এনেছে। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ১৫-১৬ বছরের মোট জনসংখ্যার ২৭.২০ কোটির বেশি মাদকাসক্ত। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর বিচ্যুত জীবন যাপন তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্যপীড়িত দেশসমূহের অন্যতম প্রধান সমস্যা। বাংলাদেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা নিরূপণে কোন জরিপ পরিচালিত না হলেও কোনক্রমেই তা অর্ধকোটির কম নয়।

বাংলাদেশ কোন মাদক উৎপাদনকারী দেশ নয়। তাছাড়া এখানে কোন সাইকেট্রপিক সাবস্ট্যান্সও উৎপাদন হয় না। শুধুমাত্র হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও সালফিউরিক এসিড ছাড়া বাংলাদেশ কোন প্রকার কেমিক্যাল উৎপাদন করে না। তবুও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ মাদকসমস্যা হতে মুক্ত নয়। আমাদের শহর-জনপদে চুরি,ডাকাতি,ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসসহ অধিকাংশ অপরাধের অন্যতম কারণ মাদকের অবৈধ ব্যবসা ও অপব্যবহার। মাদক আমাদের শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সামাজিক পরিবেশ বিপন্ন করছে। দেশে অপসংস্কৃতির বিস্তার এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় মাদকেরই বিষময় ফল। মাদকাসক্তদের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ যুবক হওয়ায় দেশের যুবসমাজ আজ মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। উপরন্তু এইচআইভি/এইচড ও হেপাটাইটিস-এর বিস্তার সহায়ক বলে মাদক জনস্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ হুমকিস্বরূপ। সরকার এ কারণে মাদক সমস্যাকে জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এ সমস্যার মোকাবেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছে।

বর্তমানে কোন একক সংস্থার পক্ষে মাদক সমস্যার মোকাবেলা করা দুরূহ কাজ। মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী কর্মসূচী বাস্তবায়নের বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু সীমিত জনবল এবং লজিস্টিক সাপোর্টের অভাবে এ অধিদপ্তর মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে পারছে না। তাছাড়া মাদক একটি বহুমাত্রিক জটিল সামাজিক সমস্যা

হওয়ায় আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থার ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রচেষ্টা সময়ের দাবি। এ প্রেক্ষাপটে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/দপ্তর/অধিদপ্তর এর সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে আসছে। বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান, কোষ্টগার্ড, আনসার ও ভিডিপি, কাস্টমস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে ইত্যাদি সংস্থা এক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সাংবিধানিক ভিত্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৮-তে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি নিম্নরূপে বিবৃত আছে'আরোগ্যে প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।'

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

১৮৫৭ সালে আফিম ব্যবসাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে প্রথম আফিম আইন প্রবর্তন এবং আফিম ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯০৯ সালে বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৬ সালে এ ডিপার্টমেন্টকে নারকটিকস এন্ড লিকার পরিদপ্তর নামে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।১৯৮৯ সাল পর্যন্ত নারকটিকস এন্ড লিকার পরিদপ্তরের মূল লক্ষ্য ছিল দেশে উৎপাদিত মাদকদ্রব্য থেকে রাজস্ব আদায় করা। আশির দশকে সারাবিশ্বে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন,১৯৯০ প্রণয়ন এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়।যুগোপযোগী করার নিমিত্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০০,২০০২ এবং ২০০৪ সালে সংশোধন করা হয়। বর্তমান সরকারের সময় আইনটির অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম

অধিদপ্তরের আইন প্রয়োগ, দাপ্তরিক কার্য সম্পাদন, মাদক নিরোধ-শিক্ষা, চিকিৎসা-পূনর্বাসন এবং অন্যান্য সহায়ক কাজের জন্য অনুমোদিত মোট জনবল ১২৮৩ জন। এর মধ্যে কর্মরত আছে ৮৪৩ জন এবং শূন্য আছে ৪৪০ জন। মঞ্জুরীকৃত প্রথম শ্রেণীর ৯১ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৫৫ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৫৪ জন এরমধ্যে ৪৩ জন, তৃতীয় শ্রেণীর ১০৩৩ জনের মধ্যে ৬৭৯ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর ১০৫ জনের মধ্যে ৬৬ জন কর্মরত আছে। অধিদপ্তরের ১২৮৩ জনবলের মধ্যে অপরাধ দমন কাজে মঞ্জুরীকৃত জনবল ৭৭৯ জন। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রেক্ষাপটে প্রায় প্রতি ২,৯৬,০০০ জন মানুষের বিপরীতে ০১ জন নিরস্ত্র মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মচারী। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিম্নে উল্লিখিত অধিশাখাসমূহের মাধ্যমে উহার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

দেশের মাদক সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এবং সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে মাদক বিরোধী কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য সরকার জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এ বোর্ডের চেয়ারপার্সন।১১ জন মাননীয় মন্ত্রী, ০২ জনসচিব ০৫ জন সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এ বোর্ডের সদস্য এবং এই বোর্ডের অন্যতম কাজ দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও চোরাচালান রোধ এবং মাদক বিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নীতিমালা তৈরি ও তা বাস্তবায়নে অধিদপ্তরকে দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

বিধিমালাসমূহ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করার নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত বিধিমালাগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে :

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা-১৯৯০
- জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড তহবিল বিধিমালা-২০০১
- এ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ (লাইসেন্স ফি) বিধিমালা-২০০২

- বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা-২০০৫

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর সংশোধন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-কে যুগোপযোগী করার জন্য, বিশেষতঃ নতুন নতুন মাদককে আইনের আওতাভুক্ত করা, অপরাধ ও শাস্তির বিধানকে আরো সুবিন্যস্ত ও সুস্পষ্ট করা মাদক অপরাধকে মোবাইল কোর্টের আওতায় আনা, মাদক আইনের প্রয়োগ ক্ষেত্রে অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকাকে সুনির্দিষ্ট করা এবং অপরাধের তদন্ত ও বিচারকার্যকে ত্বরান্বিত করার জন্য সংশোধনীর খসড়া প্রণীত হয়েছে। উক্ত খসড়ার উপর সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার প্রদত্ত মতামত যাচাই করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি ওয়ার্কিং কমিটি সংশোধিত খসড়াটি আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত করেছে। উক্ত চূড়ান্ত খসড়ার উপর আইন সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মাদক সমস্যা একটি অত্যন্ত জটিল সমস্যা। সমাজের অন্যান্য সমস্যা ও সংকট সমূহের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। কোন একক সংস্থার পক্ষে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

গাইবান্ধা সার্কেলের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য পদ
সহকারী পরিচালক	০১	০১	-
অফিস সহকারী	০১	০১	-
পরিদর্শক	০১	০১	-
উপ- পরিদর্শক	০১	০১	-
সহকারী উপ- পরিদর্শক	০১	০১	-
সিপাই	০৩	০৩	-
ওয়ালেস অপারেটর	০১	-	০১
গাড়ী চালক	০১	-	০১
নাইট গার্ড	০১	-	০১
এল.এম.এস.এস	০১	-	০১
সুইপার	০১	-	০১
সর্বমোট=	১৩	০৮	০৫

গাইবান্ধা জেলার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২০১৫ সালের মামলা বিবরণ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)

মাসের নাম	অভিযানের সংখ্যা	নিয়মিত মামলা	মোবাইল কোর্ট	গ্রেফতার নারী	পলাতক নারী	গ্রেফতার পুরুষ	পলাতক পুরুষ	হেরোইন	ইয়াবা	ফেনসিডিল	গাঁজা	গাঁজা গাছ	চোলাই মদ	ওয়াশ	বিলাতি মদ	দেশী মদ	আর.এস
জানু:	০৫	-	০১	-	-	০১	-	-	-	-	২০ কেজি	-	-	-	-	-	-
ফেব্রু:	১০	-	০৫	০২	-	০৩	-	-	-	-	৬ কেজি ৫০০ গ্রাম	-	-	-	-	৬লিটার	-
মার্চ	১৮	০৪	০৬	০৫	-	০৫	০২	-	-	-	৬ কেজি ৫৮০ গ্রাম	-	-	-	১৯ টি বোতল	৭লিটার	৩৪৮০০ মিলি
এপ্রিল	২১	০২	০৮	-	-	১০	-	৫গ্রাম	০২টি ট্যাবলেট	৫ বোতল	২ কেজি ৩৫০ গ্রাম	-	-	-	-	১৩ লিটার	-
মে	২৪	০২	০৮	০১	-	০৮	০১	-	২৩টি ট্যাবলেট	-	৩ কেজি ৯২০ গ্রাম	-	১০ লিটা:	-	-	১৪ লিটার	সাইকেল ১টি, গাঁজা

																	সেবক ১ জন
জুন	২২	-	১০	০৩	-	০৭	-	-	১০টি ট্যাবলেট	-	২ কেজি ৪০০গ্রাম	১টি	-	-	-	-	-
জুলাই	২৪	০২	১০	০৩	-	০৮	০১	-	২টি ট্যাবলেট	-	৬ কেজি ২০০গ্রাম	-	৩০ লিটা:	৯০০ লিটার	-	০২ লিটার	-
আগস্ট	২২	০২	০৮	০১	-	১০	-	-	২০টি ট্যাবলেট	১০টি বোতল	২ কেজি ৪০০গ্রাম	-	-	-	-	-	-
সেপ্টে:	২৪	০১	০৯	০২	-	০৮	-	-	-	-	৪ কেজি ৩৬০গ্রাম	০১টি	-	-	১৭টি বোতল	১২ লিটার	৫০লি:
অক্টো:	২৪	০৪	০৮	০৪	-	১০	-	১গ্রা:	১০টি	-	৩ কেজি ২০০গ্রাম	-	২০ লিটা:	৫০০ লিটার	-	১০ লিটার	৪৮ বোতল
নভে:	১০	০১	১০	০৩	-	০৭	০১	-	৫৫০টি ট্যাবলেট	-	৪ কেজি ৯৮০গ্রাম	০২টি	-	-	-	-	-
ডিসে:	২৫	০৫	০৮	০২	-	১০	০১	-	-	-	৫ কেজি ৭১০গ্রাম	-	২৫ লিটা:	১২০ লিটার	-	-	৪৮টি বোতল
মোট-	২২৯	২৩	৯১	২৬	-	৮৭	০৬	৬০০ গ্রাম	৬১০ ট্যাবলেট	১৫ টি বোতল	৪৮ কে: ৬০০গ্রাম	০৪টি	৮৫ লিটার	১৫২০ লিটার	৩৬ টি বোতল	৬৪ লিটার	-

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রশাসন সারা বছর তৎপর ছিল । যার প্রমাণ উপরোক্ত ছকে পাওয়া যায় । প্রশাসন সারা বছর প্রচুর পরিমাণে মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে । সাথে সাথে মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ীকেও গ্রেফতার করেছে । কিন্তু প্রশাসনের তৎপরতা থাকা সত্ত্বেও মাদকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না । মাদকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন এবং সাধারণ জনগণের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন এবং পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই ।

বালাসি এখন 'ইয়াবার হাট' (সাপ্তাহিক চলমান জবাব ॥ ২৯.০৬.২০১৫)

গাইবান্ধা জেলায় কিশোর-তরুণ থেকে শুরু করে সব বয়সী ও পেশার মানুষের উপর মরণ থাবা ফেলেছে সর্বনাশা ইয়াবা ট্যাবলেটের নেশা । মাদক হিসেবে ব্যবহৃত ইয়াবা ট্যাবলেটের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন অনেক আগেই শহর ছাড়িয়ে এখন গ্রাম থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে । জেলার সাতটি উপজেলার ৮২ ইউনিয়নের এমন কোন গ্রাম নেই যে গ্রামে ইয়াবা কেনাবেচার অন্তত: দুইটি স্পট নেই । এছাড়াও জেলার তিনটি পৌরসভায় ইয়াবা কেনাবেচা ও সেবনের স্পটগুলোতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ঘনঘন অভিযান ও ধরপাকড়ের কারণে অনেক স্পট বন্ধ হয়ে গেছে । গ্রেফতার এড়াতে শহরাঞ্চলের অনেক মাদক ব্যবসায়ী গা ঢাকা দিয়েছে আবার কেউবা গ্রামে পালিয়ে গিয়ে সেখানে নতুন করে ইয়াবা ও গাঁজার ব্যবসা করছে । এমতাবস্থায় অভিভাবকরা চরম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন । গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন গ্রাম সরেজমিনে ঘুরে এবং মাদক ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্মকর্তার সাথে কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে ।

অনিয়ম ও দুর্নীতি

সারাবিশ্বের মানুষকেই দুর্নীতি নামক সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়, যদিও এর বিস্তার ও তীব্রতা সবক্ষেত্রে এক রকম নয়। ২০১৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে যেমন নানা ধরনের দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে তেমনি গাইবান্ধা জেলায়ও নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

দুর্নীতি, মানবাধিকার, বৈষম্য

সমাজে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের যে পরিসীমা দুর্নীতি তার জন্য ক্ষতিকারক। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কনভেনশন ঘোষণা অনুযায়ী নীতিহীনতার চর্চা অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সুশীল বা রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই মানবাধিকার খর্ব করে, যদিও ক্ষেত্র বা ঘটনাভেদে এর প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

দুর্নীতি ন্যায্য বিচারের অধিকার এবং কার্যকর প্রতিকারের পথ রুদ্ধ করে দিতে পারে (নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারপত্র ১৪, ২.৩)। দুর্নীতির ফলে তৈরি হয় বৈষম্য (মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা, ধারা-১)। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি যখন আরো দুর্নীতিসহ বিভিন্ন উপায়ে নিজেকে রক্ষা করতে যায়, তখন যাদের হাতে ক্ষমতা নেই যেমন সুবিধা বঞ্চিতরা আরো বেশি শোষণ-নিপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার হয়। অন্যদিকে পক্ষপাতদুষ্ট আইনের প্রয়োগ ও দুর্বল বিচার ব্যবস্থা মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টিকে অনেক নিচে নামিয়ে দেয়। বিশেষ করে শিশু অধিকার ও সংখ্যালঘুদের অধিকার, আদিবাসী সম্প্রদায় এবং সমাজের অন্যান্য অনগ্রসর অংশের অধিকার চরমভাবে খর্ব হয়।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকারসহ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সবই লঙ্ঘিত হয় দুর্নীতির কারণে। যখন নীতিহীনতা চর্চার কারণে তহবিল চুরি হয়, আত্মসাৎ বা অপচয় হয় বা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদাগুলো প্রাপ্তির বিষয়টি ঘুষ নির্ভর হয়ে পড়ে, তখন অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। যখন দুর্নীতির বিস্তার ঘটে এসব অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র এর সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে পারেনা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবিচার ঘটতে থাকে যার ভোগান্তি সবচাইতে বেশি পোহাতে হয় দরিদ্র, শিশু এবং অন্য সুবিধাবঞ্চিতদের।

গাইবান্ধা জেলার অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র

গাইবান্ধা জেলা থেকে প্রকাশিত স্থানীয় সংবাদপত্রে উঠে আসা কিছু দুর্নীতির ঘটনা নিম্নরূপঃ

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগঃ সাঘাটা উপজেলা পাছ গড়গড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগে প্রকাশ উপজেলার কামালেরপাড়া ইউনিয়নের পাছ গড়গড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ইতিপূর্বে রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকাকালীন প্রধান শিক্ষক লুৎফর রহমান সপ্তাহে ২/৩ দিন বিদ্যালয়ে এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে চলে যেত। স্কুলে নিয়মিত আসার বিষয়টি নিয়ে অভিভাবকগণ অভিযোগ করলে তিনি বেতন ভাতা কম পান এ অজুহাত দিত। এদিকে বিদ্যালয়টি সরকারিকরণ করা হলেও প্রধান শিক্ষক লুৎফর রহমান অনিয়মিত এবং বিলম্বে বিদ্যালয়ে আসেন। ফলে একদিকে যেমন সহকারি শিক্ষকদের পাঠদানে অমনোযোগীতা থাকে অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যহত হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষানুরাগী জনৈক ব্যক্তি জানায়, উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা স্লিপের টাকা উত্তোলন করে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছেন। অথচ প্রধান শিক্ষক লুৎফর রহমান স্লিপের ১৫ হাজার টাকা উত্তোলন করে কাজ না করে তা আত্মসাতের পায়তারা করছেন। (দৈনিক ঘাঘট, ১৮ মে ২০১৫)

সুন্দরগঞ্জে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এতিমখানার অর্থ আত্মসাতের অভিযোগঃ সুন্দরগঞ্জ উপজেলার শান্তিরাম ইউনিয়নের চেয়াম্যান আব্দুল হান্নান সরকার মান্নান এর বিরুদ্ধে এতিমখানার অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে এই চেয়ারম্যান বিভিন্ন দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহারসহ ভুয়া প্রকল্প দেখিয়ে সরকারের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন মর্মে ইতিমধ্যে উক্ত ইউপি সদস্যরা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তরে নিরপেক্ষ তদন্ত ও শাস্তির দাবি জানিয়ে অভিযোগ করেন। এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ২৬ এপ্রিল উপজেলা নির্বাহী অফিসার তদন্ত করেন। এছাড়া চেয়ারম্যান তার পিতা মরহুম মশর মামুদ ব্যাপারীর নামে হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা দেখিয়ে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এক লাখ টাকা উত্তোলন করেন মর্মে ইউপি সদস্যরা পুনরায় আরেকটি অভিযোগ করেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ওই প্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষক কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রী নেই। তিনি উক্ত টাকাসহ বিভিন্ন অনুদান প্রতিষ্ঠানটির নামে বরাদ্দ নিয়ে নিজেই আত্মসাৎ করে অসছেন। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আব্দুল হাই মিল্টন জানান, সকল অভিযোগের অধিকতর তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। (দৈনিক ঘাঘট, ৭ মে ২০১৫)

সুন্দরগঞ্জে ভিজিডি মাল বিতরণ না করায় চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তদন্ত: উপজেলার ধোপাডাঙ্গা ইউনিয়নে দীর্ঘ ৫ মাসে ১২৮ ভিজিডি সুবিধাভোগীদের মাঝে মাল বিতরণ না করায় চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তদন্ত হলেও আজও তা বিতরণ হয়নি। জানা গেছে, উক্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মাহবুব আলম শাহীনের সাথে ইউপি সদস্যদের ভিজিডি সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রস্তুতে মতবিরোধ দেখা দেয়। এ নিয়ে সদস্যরা স্থানীয় সাংসদসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের তদন্ত অনুষ্ঠিত হলেও দীর্ঘ ৫ মাসেও ২০১৫-১৬ ভিজিডি মাল থেকে বঞ্চিত রয়েছেন সুবিধাভোগীরা। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আব্দুল হাই মিল্টন মাল বিতরণের জন্য চেয়ারম্যানের নিকট তিন দফা পত্রাদেশ দিলেও আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এদিকে চেয়ারম্যান জানান, যথাসময়ে সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রস্তুত করে কার্ড বিতরণ শেষে সংশোধনের পত্র পাওয়ার কারণে তা বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এত করে গত জানুয়ারি থেকে উত্তোলিত মালামাল হেফাজতে রয়েছে। **(দৈনিক ঘাঘট, ৪ মে, ২০১৫)**

সাদুল্যাপুর গৃহহীনদের তথ্য তালিকা প্রণয়নে অনিয়মের প্রতিবাদে কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান: সাদুল্যাপুর উপজেলা জাতীয় কৃষক সমিতির উদ্যোগে গতকাল দুপুর ১২ ঘটিকার সময় গৃহহীন তথ্য ফরম পূরণে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দুর্নীতির কারণে জাতীয় কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে সাদুল্যাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। উপজেলার গৃহহীন পরিবারের সদস্যরা নিজ নিজ তথ্য ফরম হাতে নিয়ে সাদুল্যাপুর উপজেলা ওয়ার্কার্স পার্টির কার্যালয় থেকে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা চত্বরে উপস্থিত হন। এ সময় উপস্থিতদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রেবতী বর্মন, উপজেলা আওয়ামী লীগ এর সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার খান বিপ্লব, উপজেলা জাসদ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক আনছার আলী, জেলা আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মতিয়ার রহমান, ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক প্রণব চৌধুরী খোকন, জাতীয় কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামরুল ইসলাম, শ্রমিক ফেডারেশন বাংলাদেশ সভাপতি মোঃ খলিলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান মিলন প্রমূখ।

স্মারকলিপি গ্রহণ কালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ আহছান হাবিব বলেন, গৃহহীন তথ্য তালিকা থেকে একটি লোক যাতে বাদ না পড়ে, সে ব্যাপারে স্থানীয় চেয়ারম্যানদের নির্দেশনা দেওয়া আছে। এরপরও যদি বাদ পড়ে তাহলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে ফরম সংগ্রহ করে নাম অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। তিনি আরও বলেন, কেউ যেন দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নিতে পারে না সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। পরে কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামরুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করেন। **(দৈনিক আজকের জনগণ, ২৫ মার্চ ২০১৫)**

গাইবান্ধা সরকারি এতিমখানায় এতিমদের টাকা হরিলুট: গাইবান্ধা সরকারি বালক এতিমখানার একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে এতিমদের নামে বরাদ্দকৃত অর্থ লোপাট, অসহায় এতিমদের নির্যাতন, ভয়ভীতি ও হয়রানীর অভিযোগ উঠেছে। এতিমদের ভরণপোষণ ও অন্যান্য খাতের অর্থ ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে লোপাট করেই এ সিন্ডিকেট ক্ষ্যান্ত হয় না। সৌদি সরকারের দেয়া দুম্বার মাংস এতিমদের না খাইয়ে নিজেরা ভাগ বাটোয়ারা করে নেয় বলে অভিযোগ উঠেছে। শিশু সদনে থাকা বেশ কিছু এতিম ও এতিমখানার একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। সম্প্রতি এক মাসে কেক, মিষ্টি, রসমঞ্জুরী, সামুচা, আঙ্গুর, যৌবন বেকারির পাউরুটি ও খাসির মাংস

এতিমদের খাওয়ানো বাবদ ২০ হাজার টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। অথচ কোন এতিম এসব খাদ্য সামগ্রী ওই মাসে খায় নাই বলে জানায়। মৌসুমী ফল বাংগী, তরমুজ ছাড়াও মিলাদের জন্য জিলাপী ও সিঙ্গারা বাবদ ১০ হাজার টাকা ব্যয় দেখানো হলেও এর সামান্য অংশ পেয়েছে এতিমরা। বাকি অংশ আত্মসাৎ করা হয়েছে। ১০০ জন এতিমের জন্য সৌদি সরকারের অনুদানে প্রাপ্ত দুম্বার মাংসের বিরাট অংশ সংশ্লিষ্ট সিন্ডিকেট ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়ে যায়। এতিমখানার কারিগরি প্রশিক্ষক আব্দুল হান্নান, কম্পাউন্ডার রেজওয়ান মন্ডল বাবু ও অফিস সহকারী আব্দুল কাইয়ুমের নেতৃত্বে এতমখানার কর্মরত বিভিন্ন পদের ৫/৬ জনের একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট এসব অনিয়ম, দুর্নীতি এবং নিবাসী এতিমদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও নির্যাতন করে থাকে। খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পোষাক, তেল সাবানসহ বিভিন্ন খাতে একজন এতিমের বিপরীতে প্রতিমাসে ২ হাজার ৬শ' টাকা হিসেবে বছরে ৩১ হাজার ২শ' টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। অপরদিকে প্রশিক্ষণের বিপরীতে বছরে ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দের পুরোটাই আত্মসাৎ করা হয়। এ ব্যাপারে কারিগরি প্রশিক্ষক আব্দুল হান্নান প্রশিক্ষণের অর্থ উত্তোলন করা হয় না বলে জানান। তবে এ প্রসঙ্গে অফিস সহকারি আব্দুল কাইয়ুম প্রশিক্ষণের অর্থ অন্য খাতে খরচ করা হয় বলে দাবি করেন। খাদ্য তালিকায় দুধ আবশ্যিক হলেও বিশেষ দিন ছাড়া নিবাসীদের দুধ খাওয়ানো হয় না। চিকিৎসা খাতে বছরে ৭২ হাজার টাকা বরাদ্দ থাকলেও নিবাসী এতিমদের ভাগ্যে প্যারাসিটামল ও হিস্টাসিন ট্যাবলেট ছাড়া আর কিছু জোটে না। অফিস সহকারি কাইয়ুম কখন অফিসে আসে আর কখন যায় তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না। সহকারি শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান এবং নাজমা বেগম এক ঘণ্টার বেশি ক্লাস নেন না বলেও জানা যায়।

সুন্দরগঞ্জে ৫০ মেঃ টন আত্মসাৎকৃত চাল ফেতরার নির্দেশ: সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় ২৫টি হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার নামে ভুয়া কমিটি দেখিয়ে ৫০ মেঃটন চাল আত্মসাতের ঘটনা ঘটেছে। একটি তদন্ত টিম বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত করার পর জেলা প্রশাসককে রিপোর্ট দাখিল করা হলে উল্লেখিত উত্তোলিত চাল ফেরত প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু মাদ্রাসাগুলোর ওইসব কমিটির অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়ায় চাল ফেরৎ পাওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিগত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় ২৫টি হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার নামে ২ মেঃ টন করে মোট ৫০ মেঃটন জিআরের চাল বরাদ্দ দেয়া হয়। তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবু রাফা মোহাম্মদ আরিফ উল্লেখিত চালের বরাদ্দ দেন। এনিয়ে তৎকালীন জেলা প্রশাসক মোঃ এহছানে এলাহীর কাছে অভিযোগ করা হলে তাঁর নির্দেশে গাইবান্ধা কালেক্টরেটের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাগফুরুল হাসান আব্বাসী বিষয়টি তদন্ত করেন। তদন্তে আত্মসাতের ঘটনা সত্যতা প্রমাণিত হলে বর্তমান জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুস সামাদ গত ১০ জুলাই স্মারক নম্বর ৫১.০১.৩২০০.০০০.১৬.০০১.১৫.৬১৪ পত্র দ্বারা আত্মসাৎকৃত চালগুলো সরকারি ভান্ডারে ফেরতসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বর্তমান উপজেলা নির্বাহী অফিসার আব্দুল হাই মিল্টনকে নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান, জরুরিভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নূরুন্নবী সরকারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা জানান, বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। **(দৈনিক আজকের জনগণ, ২৮ জুলাই ২০১৫)**

সুন্দরগঞ্জে ১৩ বস্তা ভিজিএফ চাল আটক: সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ধোপাডাঙ্গা ইউনিয়নে ভিজিএফ'র চাল বিতরণকালে কালোবাজারির ঘর থেকে ১৩ বস্তা চাল আটক করেছে ইউএনও। জানা গেছে, পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে সরকার অসহায় দুঃস্থ্য মানুষের সাহায্যার্থে ভিজিএফ চাল বরাদ্দ দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় উপজেলার ধোপাডাঙ্গা ইউনিয়নে ১৬ মেঃটন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়। প্রতিজন ১০ কেজি করে ১৬০০ জন পাওয়ার কথা এ চাল। উক্ত চাল গত শুক্রবার দুস্থ অসহায়দের মাঝে বিতরণের সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইউএনও মুহাম্মদ আব্দুল হাই মিলটন পুলিশ ফোর্সসহ বিশেষ অভিযানে গিয়ে কালোবাজারিদের ঘর থেকে ১৩ বস্তা ভিজিএফ এর চাল জব্দ করেন। চাল জব্দ করার সময় কালোবাজারিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরে ইউএনওর নির্দেশে এএসআই অলম বাদশা বাদী হয়ে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫/২৫(ঘ) ধারার ওই দিনই একটি মামলা দায়ের করেন। স্থানীয় লোকদের নিকট থেকে জানা যায়, চাল আটক করার সময় ইউএনও সন্দেহজনক ২/৩ জন ইউপি সদস্যকে জিজ্ঞাসা করলে তারা নিজেরা চাল বিক্রি করেছেন বলে স্বীকার করেন। এ ব্যাপারে ইউএনও মুহাম্মদ আব্দুল হাই মিলটন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন– কালোবাজারিদের কাছ থেকে জব্দকৃত চালগুলো ইউপি সদস্যরা স্লীপের মাধ্যমে দুস্থ অসহায়দের মাঝে না দিয়ে বিক্রি করেন।

সুন্দরগঞ্জে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ: সুন্দরগঞ্জ উপজেলার শান্তিরাম ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান সরকার হান্নানের বিরুদ্ধে ইউপি সদস্যগণ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগে জানা যায়, আঃ হান্নান শান্তিরাম ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, সরকারি অর্থ আত্মসাৎসহ বিভিন্ন অনিয়ম করে আসছেন। এছাড়া গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ২৬০ জন কর্মসৃজন প্রকল্পের শ্রমিকদের অবশিষ্ট ১০% অর্থ ২ লাখ ১০ হাজার টাকা, একই অর্থ বছরে এডিবির ৯০ হাজার ভূমি হস্তান্তর কর ১ লাখ টাকা কোন প্রকার কাজ না করেই নাম মাত্র প্রকল্প দেখিয়ে সমুদয় অর্থ আত্মসাৎ করেন। এদিকে কাবিখা, টিআর কাজের বরাদ্দের পরিমাণ কোন সদস্যকে না জানিয়ে নিজের ইচ্ছামত প্রকল্প দেখিয়ে আত্মসাৎ করে আসছেন। এ ব্যাপারে উক্ত ইউপির ৬ জন সদস্য নিরপেক্ষ তদন্তসহ সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট ২ সপ্তাহ আগে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেও এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত না হওয়ার অভিযোগকারীরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। এ ব্যাপারে ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগ করলে অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি অস্বীকার করেন। (৭ এপ্রিল ২০১৫ ॥ দৈনিক জনসংকেত)

সুপারিশ

ক. প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ

১. দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ: বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। যেসব খাতে দুর্নীতির হার বেশি এবং দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসব খাতের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, আইন-শৃঙ্খলা, বিচারিক সেবা, শ্রম অভিবাসন, কর্মসংস্থান) সেসব খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্যে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. দুর্নীতির বিরুদ্ধে দক্ষতা বৃদ্ধি: দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বাড়াতে হবে। দুর্নীতিবিরোধী আইন, তথ্য অধিকার আইন ও বিশেষ করে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইনের ওপর প্রশিক্ষণ, সংক্ষুব্ধ প্রশমণ কাঠামো তৈরি/শক্তিশালীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে এ দক্ষতা বাড়াতে হবে।

৩. নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন: প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। এর ভিত্তিতে কঠোর জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. প্রণোদনা: দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার উদ্যোগ নিতে হবে। সেবা খাতে 'প্রয়োজনের তাড়নায় দুর্নীতি' প্রতিরোধে জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেতন-ভাতা নিশ্চিত করতে হবে। একইসাথে সেবাদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকা-ের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার ও তিরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. সেবা খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি: প্রতিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে, যেন সেবাগ্রহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হ্রাস পায়। যেসব সেবা খাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল পাওয়া গেছে (যেমন পাসপোর্ট, আয়কর রিটার্ন দাখিল) সেসব খাতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অন্যান্য খাতেও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনলাইন/ওয়ান স্টপ সেবা চালু করতে হবে।

৬. 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' ও 'তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন ২০১১' এর কার্যকর বাস্তবায়ন: দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনের অন্যতম উপায় তথ্যে অভিগম্যতা। সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' এর কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে যেন প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও তথ্যের উন্মুক্ততার মাধ্যমে

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবাগ্রহীতার জন্য জানার অধিকার নিশ্চিত হয়। একইসাথে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন প্রয়োগে প্রচারণা ও প্রণোদনাসহ বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।

৭. নাগরিক সনদের বাস্তবায়ন: প্রতিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রতিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সনদ সেবাগ্রহীতাদের জন্য সহজপ্রাপ্য করতে হবে। অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়া সহজ রকতে হবে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৮. সেবা প্রদান পর্যায়ে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি: সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে দাতা ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি এবং সেবার ধরণ ও মান নির্ধারণে স্থানীয় জনগণের উত্তরোত্তর অধিকতর অংশীদারীত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

খ. নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে উদ্যোগ

৯. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা: আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে (আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ) সম্পূর্ণ পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ বিশেষ করে দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। দুর্নীতি যে পর্যায়ে ও মাত্রারই হোক না কেন, তা যে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ তা আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১০. দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রণালয়ের তদারকি বৃদ্ধি: দুর্নীতি প্রতিরোধে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে সক্রিয় হতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতাভুক্ত সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়মিত পর্যালোচনা এবং তার প্রতিকারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি সরকারি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে তদারকি দল গঠন করতে হবে।

১১. জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন বাস্তবায়ন: জাতিসংঘে দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন অনুযায়ী দুর্নীতি প্রতিরোধে কনভেনশনের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে সব অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে হবে। দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন অনুযায়ী জনগণ এবং সচেতন সমাজের ভূমিকা (অনুচ্ছেদ ১৩) পালনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং জাতীয় সততা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধিতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

১২. স্বাধীন ও শক্তিশালী দুদক: দুর্নীতি দমন কমিশনকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও সক্রিয় করে তুলতে হবে। কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যেন সকল প্রকার প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যেতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে বাস্তবে কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দিতে এর সক্ষমতা, জনবল ও সম্পদ বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যদিকে কমিশনের সকল পর্যায়ের কর্মীদের পেশাগত উৎকর্ষ ও সততা বৃদ্ধি এবং দৃঢ়তা ও স্বাধীনতার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য প্রশিক্ষণসহ সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দুর্নীতি দমনের জন্য অপরিহার্য যোগ্যতা ও গুণাবলীর কোনো প্রকার ঘাটতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রয়োজনে অপসারণসহ যাচাই (স্ক্রিনিং) করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে এরূপ পদক্ষেপের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে অনুরূপ মাপকাঠি নিশ্চিত করে দুদকের সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে হবে।

গ. সচেতনতা, প্রচারণা ও অ্যাডভোকেসি

১৩. নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বৃদ্ধি: সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ নিতে হবে। বিভিন্ন সামাজিক জবাবদিহিতার টুলস (যেমন উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা, রিপোর্ট কার্ড জরিপ, স্কোর কার্ড, সততার অঙ্গীকার) ব্যবহার করার মাধ্যমে এই ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৪. গণমাধ্যমের ভূমিকা বৃদ্ধি: দুর্নীতি প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরিতে গণমাধ্যমগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইনের আওতায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশকারী

সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ প্রণোদনা ও স্বীকৃতি দিতে হবে। অন্যদিকে দুর্নীতির প্রতিবেদন প্রকাশে গুণগত মান নিশ্চিত করতে গণমাধ্যমগুলোর নিজস্ব নীতি কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

১৫. অব্যাহত গবেষণা ও পলিসি অ্যাডভোকেসি: সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির গতি-প্রকৃতি গভীরভাবে অনুধাবনের জন্যে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে যাতে ভবিষ্যতে দুর্নীতি অব্যাহতভাবে কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে করণীয়সমূহ আরও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। গবেষণাপ্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পলিসি অ্যাডভোকেসি অব্যাহত রাখতে হবে।

সর্বোপরি কারও প্রতি ভয়, করুণা ও পক্ষাপাতিত্বের উর্ধ্বে থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

পরিশেষ

দুর্নীতি অধিক কার্যকারিতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কি-না তা রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রকৃতি ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশের উপর নির্ভর করবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারকে জবাবদিহি করতে সমর্থ হলেই পরিবর্তন আসবে। কারও প্রতি ভয় বা পক্ষপাতিত্ব না করে দুর্নীতিকে সত্যি সত্যি অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে পারার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। তাছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ করা হয়েছে যার মধ্যে আছে তথ্য অধিকার আইন। এসব আইন যদি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয় তাহলে তা দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

কারাগার পরিস্থিতি

আধুনিক বিশ্বে অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য না দিয়ে বরং তাদেরকে সংশোধনের বিবেচনায় কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তোলার তাগিদ অনুভূত হয়। সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বিপদগামী মানুষকে সংশোধনের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করাই বর্তমানে আধুনিক কারা ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষ্য। উনিশ শতকের পূর্বে আধুনিক কারা ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের তেমন ধারণা ছিল না। উনিশ শতকের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ও বিস্তারের সাথে সাথে কারাগারকে শাস্তি প্রদানের স্থান থেকে সংশোধনাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। এর ফলে কারা প্রশাসন পরিচালার ক্ষেত্রে সূচনা হয় নতুন অধ্যায়ের।

বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষে কারাগার সৃষ্টি হয়েছিল ব্রিটিশ শাসন আমলে। পাঠান সম্রাট শেরশাহের আমলে চকবাজার এলাকায় নির্মিত হয়েছিল আফগান দুর্গ যা পরবর্তীতে কারাগারে রূপান্তরিত হয়। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ২টি কেন্দ্রীয়, ১২টি জেলা কারাগার এবং ৩৭টি মহকুমা কারাগার নিয়ে কারা বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে কারা প্রশাসনের সূচনা হয় ৪টি কেন্দ্রীয় কারাগার, ১৯টি জেলা কারাগার এবং ৪০টি মহকুমা কারাগার নিয়ে। এসকল কারাগারের ভবনসমূহে স্বাচ্ছন্দ্যে বন্দীদের আবাসন পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রচুর ঘাটতি ছিলো। আরো ছিল না পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা, আলো ও বিনোদনের সুব্যবস্থা। অবকাঠামোসহ প্রয়োজনীয় এসব চাহিদা যথাযথ না থাকার কারণে বন্দীদেরকে অস্বস্তি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সাথে অবস্থান করতে হতো। ফলে কারাভ্যন্তরেই বন্দীরা শরীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তো এবং আরো বড় অপরাধী হওয়ার প্রবণতা তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে দেখা যেতো। শাস্তির মেয়াদ শেষে বাহিরে বের হয়ে আরো বড় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে অপরাধ সংঘটন করতো। যাতে সমাজের অপরাধ না কমে বরং বৃদ্ধি পেতো। এসব বিষয় থেকেই বন্দীদেরকে অপরাধ জগৎ থেকে বের করার মানসে তাদের সাথে মানবিক আচরণ এবং গঠনমূলক কাজে সম্পৃক্ত ও বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষিত করে সংশোধিত সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে সমাজে পুনর্বাসিত করার প্রয়োজন দেখা যায়।

এ কারণেই বৃহৎ পরিসরে নতুন কারাগার নির্মাণ, বিদ্যমান কারাগারকে সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কারাগারকে আধুনিকরণের অংশ হিসেবে শুরু হয় নতুন চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা। তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬টি পুরানো কারাগারের অবকাঠামো নতুন করে নির্মাণ করা হয়। এছাড়া ৫টি কারাগার নির্মাণাধীন, ৫টি সম্পূর্ণরূপে নতুনভাবে নির্মিত, ১টি সংস্কার পূর্বক আধুনিকায়ন করা হয় এবং বাকিগুলোর সংস্কারের কাজ চলছে। দেশে বর্তমানে ৬৮টি কারাগার রয়েছে। যার মধ্যে ৫৫টি জেলা কারাগার এবং ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার। ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার কাশিমপুরে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-০১, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-০২, কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার ও কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ করা হয়েছে এবং ঢাকার অদূরে কেরাণীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরিত করার লক্ষ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মিত হয়েছে।

সাধারণ নাগরিকদের মতো কারাবন্দীদেরও সাংবিধানিক অধিকার আছে। কিন্তু বাংলাদেশে কারাবন্দীদের অধিকারগুলো খুব ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা যাবে না। তাই কারাগার পরিস্থিতি অথবা কারাবন্দীদের অবস্থার উন্নয়নের কোন প্রসংশনীয় উদ্যোগ নেই বললেই চলে। দেশের কারাগারগুলোর ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত কারাবন্দীর সংখ্যা। স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভাব, কারাবন্দীদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও চিকিৎসার সুযোগের অভাব, কারাবন্দীদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধাগুলো নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়ম ইত্যাদি যেন কারা পরিস্থিতির স্বাভাবিক অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে বিগত বছরগুলোর মতোই আলোচিত বছরে বাংলাদেশের কারাগারগুলোর সাধারণ পরিস্থিতির এবং কারাবন্দীদের অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি।

অপরাধীর শাস্তি হিসেবে কারাভোগের বিধান থাকলেও শাস্তি প্রদানই কারাগারে বন্দী প্রেরণের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, কারাগারে প্রেরণের মাধ্যমে বন্দীদের সংশোধন করাও এরমধ্যে অন্যতম। মনে করা হয়, প্রত্যাবাসন নয়, শাস্তিই দন্ড-প্রাপ্তদের পাওনা। এই ক্রমবর্ধমান অবহেলার কারণে কারা পরিস্থিতির এই দুর্দশা এবং দন্ডি-ত ও বিচারাধীন

কারাবন্দীদের প্রতি এতো অবজ্ঞা। যদিও কারাবন্দীদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ এবং কারা প্রতিষ্ঠানগুলোর যথাযথ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জাতিসংঘের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করার কোন প্রয়াস প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও দেখা যায় নাই। কারাবন্দীদের অধিকার নিয়ে প্রশাসন ও জনগণও খুব একটা সচেতনতা নয়।

আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা

ইন্টারন্যাশনাল কাভনান্ট অন সিভিল এন্ড পলিটিক্যাল রাইটস (আইসিসিপিআর) অনুযায়ী– 'মুক্ত জীবনের সুযোগবঞ্চিত এমন সব ব্যক্তির প্রতি: মানুষের জন্মগতভাবে প্রাপ্য মর্যাদার কারণে মানবিক ও সম্মানজনক ব্যবহার করতে হবে। আইসিসিপিআর স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বিচারাধীন ব্যক্তিদের সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের থেকে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বন্দীদের প্রাপ্ত বয়স্কদের থেকে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করতে, বন্দীদের যথাসম্ভব দ্রুত বিচারের সম্মুখীন করতে এবং হেফাজতে বা বন্দী থাকা সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে মানবিক আচরণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক প্রণীত কারাবন্দীদের প্রতি আচরণ বিষয়ক জাতিসংঘের ন্যূনতম মানসম্মত আচরণবিধিতে (দি ইউএন স্ট্যান্ডার্ড মিনিমাম রুলস্ ফর ট্রিটমেন্ট অব প্রিজনার্স) কারাবন্দীদের প্রতি যথাযথ আচরণ ও কারা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ দিক নির্দেশনা মোতাবেক কারাবন্দীদের জীবনের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বন্দীদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা এবং বন্দীদের কারামুক্তি পরবর্তী স্বাভাবিক সামাজিক জীবনে খাপ খাইয়ে নেয়ার মত পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি করা ইত্যাদি মৌলিক নীতিগুলো পালন করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। অধিকন্তু কারাগারের নিয়ম-কানুন সম্পর্কিত তথ্য জানার অধিকার, ধর্ম বিশ্বাস বিষয়ক অধিকার এবং অসুস্থতাজনিত কোন মৃত্যুর ঘটনা সেই বন্দীর পরিবারকে জানানো ইত্যাদি বিষয়ে বন্দীদের অধিকারের প্রতি কারা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্মান দেখানোর প্রয়োজন রয়েছে।

আইন/নীতিমালা

উপমহাদেশের ব্রিটিশ উপনিবেশকালে প্রণীত 'কারা আইন-১৮৯৪' এবং পরবর্তী সময়ে 'কারাবিধি-১৯২০' এর আওতায় স্বাধীন বাংলাদেশের কারা-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে এসেছে। ফলে আটক ও শাস্তি প্রদানের জায়গা বা প্রতিষ্ঠান হিসেবেই কারাগারকে বিবেচনা করা হয়েছে এবং কারাবন্দীদের মানবাধিকার বিষয়টি কখনো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। ফলে কারাগারগুলোতে বন্দীদের সাথে অমানবিক ও মর্যাদাহানিকর আচরণ এবং তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও স্বাতন্ত্র লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত ছিল। অনেক দিন পর ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঔপনিবেশিক আমলের বিধিবিধান সংশোধনের ভিত্তিতে একটি খসড়া কারাবিধি অনুমোদন করে। এ কারাবিধিতে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা: যেমন কারাগারে বন্দীদের পরিচয়, লিঙ্গ, বয়স, অপরাধের তথ্য, অপরাধের ধরনের ভিত্তিতে বন্দীদের পৃথককরণের বিষয়গুলোর প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমান কারাবিধিতে উন্মুক্ত কারাগার ও কারা-শিবির প্রতিষ্ঠা, কারাবন্দীদের ডিভিশন প্রদান বা প্রত্যাহারের ব্যাপারে কারা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা (এ বিষয়ে পূর্বে শুধু আদালত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন) এবং কারাবন্দীদের জন্য পৃথক রান্নাঘর ও শৌচাগারের ব্যবস্থার মতো কিছু বিকল্প ব্যবস্থার সংযোজন করা হয়েছে। সেই সাথে বর্তমান কারাবিধিতে কারাবন্দীদের বিনোদনের ব্যবস্থা, কারাগারের ভেতর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা, ডিভিশন প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ, কারাবন্দীদের শর্তসাপেক্ষে (প্যারোলে) মুক্তি প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ কারাবিধিতে কারাবন্দীদের মধ্যে বৈষম্যমূলক খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা ও কঠোর শাস্তিমূলক সশ্রম কারাদ-ের বিধান বাতিল করা হয়েছে।

কারা অধিদপ্তর-এর ভিশন

রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ।

কারা অধিদপ্তরের মিশন

- বন্দীদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা

- কারাগারের কঠোর নিরাপত্তা ও বন্দীদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখা
- বন্দীদের সাথে মানবিক আচরণ করা, যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাত নিশ্চিত করা এবং
- একজন সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মোটিভেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

গাইবান্ধা জেলা কারাগার পরিচিতি

গাইবান্ধা জেলা কারাগারটি ১৮৯০ সালে উপ-কারাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে এটি জেলা কারাগারে রূপান্তরিত হয়। ২০০৬ সালে ১৭ ফেব্রুয়ারি গাইবান্ধা জেলা কারাগারটি শহর থেকে প্রায় ০৫ (পাঁচ) কিলোমিটার পশ্চিমে পলাশবাড়ী রোডের দক্ষিণ পার্শ্বে ঝিনেশ্বর নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। কারাগারে মোট জমির পরিমাণ ৬.০০ একর তন্মধ্যে ভিতরে ৪.০০ একর এবং বাহিরে ২.০০ একর। কারাঅভ্যন্তরে বিদ্যমান স্থাপনার মধ্যে রয়েছে হাজতি/কয়েদী ওয়ার্ড ০৮টি, হাসপাতাল ওয়ার্ড ০১টি, সেল ১০টি। কারা অভ্যন্তরের বাহিরে বিদ্যমান স্থাপনার মধ্যে রয়েছে কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্টাফ কোয়ার্টার ০৫টি, কারারক্ষী ব্যারাক ০১টি, মসজিদ ০১টি।

গাইবান্ধা জেলা কারাগারের জনবল কাঠামো

ক্রমিক নং	পদবী	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত	শূন্যপদ
১.	জেল সুপার	০১	০১	-
২.	সহকারী সার্জন	০১	-	০১
৩.	জেলার	০১	০১	-
৪.	ডেপুটি জেলার	০১	০১	-
৫.	কারা সহকারী	০১	০১	-
৬.	ডিপ্লোমা নার্স/ফার্মাসিষ্ট	০১	০১	-
৭.	প্রধান রক্ষী	০৩	০৩	-
৮.	কারারক্ষী	৩১	৩০	০১
৯.	মহিলা রক্ষী	০৫	০৫	-
	সর্বমোট=	৪৫	৪৩	০২

গাইবান্ধা জেলা কারাগারে বন্দীদের সংখ্যাধিক্য

বাংলাদেশের কারাগার ব্যবস্থায় ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘকালীন সমস্যা হলো কারাগারগুলোতে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দীদের কারাগারে অবস্থান। গাইবান্ধা জেলা কারাগারের ধারণক্ষমতা ২০০ জন, এর মধ্যে নারী ১০ জন এবং পুরুষ ১৯০ জন। ধারণক্ষমতার বিপরীতে গাইবান্ধা জেলা কারাগারে ১৭/১১/২০১৫ তারিখ অনুযায়ী বন্দীর সংখ্যা নারী ২১ জন এবং পুরুষ ৭৮১ জন অর্থাৎ মোট ৮০২ জন। এর মধ্যে সশ্রম কারাদ- প্রাপ্ত বন্দীর সংখ্যা ৯১ জন (নারী ০৪, পুরুষ ৮৭) এবং বিনাশ্রম কারাদ-প্রাপ্ত বন্দীর সংখ্যা ১৫১ জন (নারী ০২, পুরুষ ১৪৯)। বিচারের আওতাধীন বন্দীর সংখ্যা ৫৬৯ জন।

কারাবন্দীদের অবস্থা ও ধারণ ক্ষমতা

ক. মোট ধারণ ক্ষমতা	২০০ জন	খ. মোট বন্দীর সংখ্যা	৮০২ জন
গ. ধারণ ক্ষমতা (পুরুষ)	১৯০ জন	ঘ. পুরুষ বন্দীর সংখ্যা	৭৮১ জন
ঙ. ধারণ ক্ষমতা (মহিলা)	১০ জন	চ. মহিলা বন্দীর সংখ্যা	২১ জন
ছ. ধারণ ক্ষমতা (কিশোর)	--	জ. কিশোর বন্দীর সংখ্যা	--
ঝ. ধারণ ক্ষমতা (ডিভিশন)	--	ঞ. ডিভিশন বন্দীর সংখ্যা	--
ট. বিডিআর	১৮জন		

শ্রেণীভিত্তিক বন্দীর সংখ্যা

বন্দীর ধরণ	ধারণ ক্ষমতা	সাজা প্রাপ্ত				বিচারাধীন	বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক
		ফাঁসি	সশ্রম	বিনাশ্রম	মোট		
পুরুষ	১৯০	০১	৮৭	১৪৯	২৩৭	৫৫৪	--
মহিলা	১০	-	০৪	০২	১৬	১৫	--
মোট	২০০	০১	৯১	১৫১	২৫৩	৫৬৯	--

দীর্ঘদিন আটক বন্দী

ক. ৬ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত আটক বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা	৪৫
খ. ১ বছর থেকে ২ বছর পর্যন্ত বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা	২২
গ. ২ বছর থেকে ৩ বছর পর্যন্ত বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা	০৮
ঘ. ৩ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা	১০
ঙ. ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় ১৫ দিনের বেশি আটক বন্দীর সংখ্যা	--
চ. ১৫ দিনের বেশি আটক নিরাপত্তা হেফাজতির সংখ্যা	--
ছ. ২ মাসাধিককাল যাবত আদালতে নেয়া হয় না এমন বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা	--
জ. ৩ মাসাধিককাল যাবত আদালতে নেয়া হয় না এমন বিচারাধীন বন্দীদের বিষয় জেলা জজ আদালত বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে আনুষ্ঠানিক পত্র দ্বারা অবহিত করা হয় কিনা?	--

কারাগারগুলো যে অতিরিক্ত বন্দী ধারণ করতে বাধ্য হচ্ছে মোটা দাগে তার কারণ দেশের মামলা নিস্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা দেখা দিচ্ছে। এতে বিনা বিচারে বছরের পর বছর ধরে অভিযুক্তদের থাকতে হচ্ছে কারাগারে। বন্দীর এই চাপ কমাতে হলে ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার বিদ্যমান ত্রুটিগুলো দূর করতে হবে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিচারাধীন হাজতিদের একটি বড় অংশ নিরপরাধ। হয়রানিমূলক ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য কারণে তারা হাজতবাস করছেন। এদের অধিকাংশই আবার দরিদ্র শ্রেণীর। বিলম্বিত বিচারব্যবস্থার কারণে তারা মাসের পর মাস, কখনও আবার বছরের পর বছর কারাগারে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। রাজনৈতিক কারণে ফৌজদারি মামলার সংখ্যাও বাড়ছে সাম্প্রতিককালে। বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা ও রাজনৈতিক কারণে ফৌজদারি মামলা-এই দুই বিষয়ের নিস্পত্তি করা গেলে কারাগারের ওপর থেকে বন্দীর চাপ অনেকটাই কমবে বলে ধারণা করা যায়।

কারাগারে নারী বন্দী

গত ১৭/১১/২০১৫ তারিখ অনুযায়ী গাইবান্ধা জেলা কারাগারে ১০ জন নারী বন্দীর ধারণক্ষমতার বিপরীতে নারী বন্দী আছে ২১ জন। এর মধ্যে সশ্রম দ-প্রাপ্ত নারী বন্দী ০৪ জন, বিনাশ্রম দ-প্রাপ্ত নারী বন্দী ০২ জন এবং বিচারের আওতাধীন নারী বন্দী ১৫ জন।

কারাবন্দীদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা

কারাগারে অবস্থানরত বন্দীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য একজন সহকারী সার্জন এবং একজন ফার্মাসিস্ট রয়েছে। কারাগারের অভ্যন্তরে রয়েছে ২১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল। এখানে বন্দীদের যাবতীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় এবং সরকারি পর্যায় থেকে সকল ধরনের পর্যাপ্ত ঔষধ বন্দীদের জন্য সরবরাহ করা হয়। কারাভ্যন্তরে যে সকল চিকিৎসা সুবিধা পাওয়া যায় না সে ধরনের চিকিৎসা সুবিধার জন্য জেলা হাসপাতাল এর ওপর নির্ভরশীল ।কারাগারে বন্দীদের চিকিৎসা সুবিধা দেখভাল করার জন্য রয়েছে সরকারি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমিটি। উক্ত কমিটিতে সভাপতি ডিসি মহোদয় এবং সদস্য হিসেবে রয়েছে সিভিল সার্জন, পুলিশ সুপার এবং পৌরসভার মেয়র। উক্ত কমিটি প্রতি তিনমাস পরপর মিটিং করে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে।

জেলা কারাগারে সরকারি পরিদর্শকের তালিকা

০১.	জনাব মাহাবুব আরা বেগম গিনি মাননীয় সংসদ সদস্য-৩০, গাইবান্ধা-২	নভেম্বর/১৪ হতে জুন/১৫ পর্যন্ত (০৮ মাস)
০২.	জনাব ডা: মোঃ ইউনুছ আলী সরকার মাননীয় সংসদ সদস্য-৩১, গাইবান্ধা-৩	নভেম্বর/১৪ হতে জুন/১৫ পর্যন্ত (০৮ মাস)
০৩.	জনাব এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া মাননীয় সংসদ সদস্য-৩০, গাইবান্ধা-৫	জুলাই/১৫ হতে ফেব্রুয়ারি/১৬ পর্যন্ত (০৮ মাস)
০৪.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য-৩২, গাইবান্ধা-৪	জুলাই/১৫ হতে ফেব্রুয়ারি/১৬ পর্যন্ত (০৮ মাস)
০৫.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য-৩২, গাইবান্ধা-৪	মার্চ/১৬ হতে অক্টোবর/১৬ পর্যন্ত (০৮ মাস)
০৬.	জনাব মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য-২৯, গাইবান্ধা-১	মার্চ/১৬ হতে অক্টোবর/১৬ পর্যন্ত (০৮ মাস)

জেলা কারাগারে বেসরকারি পরিদর্শকের তালিকা

০১.	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ হক্কানী, পিতা-মৃত আলহাজ্ব আব্দুর রাজ্জাক হক্কানী, গাইবান্ধা।
০২.	জনাব মোঃ রেজাউল করিম রেজা, পিতা-মরহুম গোলাম কিবরিয়া, থানাপাড়া, গাইবান্ধা।
০৩.	জনাব শাহ মাসুদ জাহাঙ্গীর কবির মিলন, পিতা-এ্যাডভোকেট শাহ মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর, পি.কে বিশ্বাস রোড, গাইবান্ধা।
০৪.	জনাব মাহামুদা পারুল, স্বামী-হাফিজার রহমান পান্না, কলেজ রোড, থানাপাড়া, গাইবান্ধা।
০৫.	জনাব শাহানা বেগম, স্বামী-মোহাম্মদ হোসেন ফকু, গোলাপবাগ বন্দর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

সুপারিশ

- কারা ব্যবস্থাপনাকে সংশোধনমূলক করে কারাবন্দীদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্রিটিশ আমলে প্রণীত কারাগার সংক্রান্ত সকল আইন ও বিধিসমূহ সংশোধন করে আধুনিক ও কল্যাণমূলক করা।
- কারাগার পরিদর্শনের জন্য একটি স্বাধীন ও সরকারের প্রভাবমুক্ত কারাপরিদর্শক দল গঠন করা যারা স্বাধীনভাবে তাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন কারাগার পরিদর্শন করে যে কোন কারাবন্দীর স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারবে এবং পরিদর্শনের ভিত্তিতে তারা রাষ্ট্র প্রধানের নিকট সুপারিশমালা পেশ করবে।
- কারাভ্যন্তরে অব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিযোগ প্রক্রিয়া সংশোধন করে নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চুক্তির ঐচ্ছিক প্রটোকল বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণের ব্যবস্থা করা।
- কারাগারে বৃত্তিমূলক ও সংশোধনমূলক পরিবেশের ব্যবস্থা করা যাতে করে কারাগার অপরাধী তৈরীর কারখানা না হয়ে, তা সংশোধনাগারে পরিণত হয়।
- কারাবন্দীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকল্প আয়ের সংস্থানপূর্বক সমাজে পূণ:প্রতিষ্ঠিত করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- কারাবন্দীদের নিয়মিত কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। কারাবন্দীদের চিত্ত বিনোদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা। কারাবন্দীদের জন্য পর্যাপ্ত খেলাধূলার ব্যবস্থা, নিয়মিতভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনসহ কারাবন্দীদের দৈনিক সংবাদপত্র পড়া ও টেলিভিশন দেখানোর ব্যবস্থা করা। একই সাথে কারাবিধি অনুযায়ী কারাবন্দীদের খাদ্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা।
- কারা হাসপাতালসমূহে প্যাথলজিক্যাল, রেডিওলজিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল সুবিধাদি সহজলভ্য করা এবং বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- মানুষের জন্মগত মর্যাদা বিবেচনায় সব কারাবন্দীর প্রতি মানবিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

- সাধারণ মামলা/অপরাধের সাথে জড়িত বিচারাধীন কারাবন্দীদের সম্ভব হলে আদালতে উপস্থিত করার প্রথম দিনই জামিনে মুক্তি দেয়া উচিত। তা সম্ভব না হলে তাদের মামলাগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পর্যালোচনা করা উচিত।
- কারা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের কাজে নিয়োজিত সব কারাকর্মকর্তা ও কর্মীদের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় নীতি বিষয়ে বিশেষত কারাবন্দীদের প্রতি আচরণ সম্পর্কিত ন্যূনতম বিধি সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা।
- কারা পর্যবেক্ষকদের নাম-ঠিকানা জনসাধারণকে জানানো, যেন কারাগারের দুর্ভোগ বা খারাপ আচরণের বিরুদ্ধে তাদের আত্মীয় স্বজনরা পর্যবেক্ষকদের কাছে অভিযোগ জানাতে পারে।
- স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে কারা পর্যবেক্ষক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং কারা পরিদর্শনের পর তাদের প্রাপ্ত তথ্য প্রতিবেদন জনগণকে জানানোর ব্যবস্থা করা।

কারাগার হতে মুক্তি পেয়ে বন্দিরা যাতে সমাজের অন্য দশজন লোকের ন্যায় কাজ করার সুযোগ পায় এবং আর যেন বিপথগামী না হয় সেদিকে সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদেরকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসিত করতে কারাভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এবং মুক্তির পর বাহিরে কর্মসংস্থান প্রাপ্তিতে বা প্রয়োজনে অধিকতর প্রশিক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ, শ্রম, ধর্ম, যুব ও ক্রীড়া, তথ্য ও প্রযুক্তি, শিল্প, বৈদেশিক ও কর্মসংস্থান, পর্যটন, কৃষি, মৎস্য ও গবাদি পশুপালন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারে। এনজিওরা এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারে। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো হতে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া যেতে পারে। আর এবাবে কারাগারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত যথাযথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদেরকে সংশোধনপূর্বক দায়িত্বশীল সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও পুনর্বাসিত করে সমাজ উন্নয়নের কাজে লাগানো সম্ভব হতে পারে বর্তমানে যা অতীব জরুরি।

একটি দেশের কারাগারগুলোর বন্দীর সংখ্যা যত বেশি হবে, বুঝতে হবে সে দেশে অপরাধ সংঘটনের পরিমাণ বেশি অথবা দেশটির বিচারব্যবস্থায় রয়েছে গলদ। আমাদের দেশে এই দুই কারণই বিদ্যমান। নিরপরাধ ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করার প্রবণতা রয়েছে পুলিশ প্রশাসনসহ স্বার্থান্বেষী মহলের। এ প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে, বিশেষ করে সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে। এর বাইরে কারাগারে আটক দরিদ্রদের আইনি সহায়তার ব্যবস্থা করেও অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকে আটকাবস্থা থেকে মুক্ত করা সম্ভব। এক হিসাবে ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় দুই-তৃতীয়াংশ হাজতি বিচারাধীন মামলায় জামিন না পেয়ে কারাবন্দী হয়ে আছেন। যাদের শাস্তি হবে দুই বছর, অথচ কারাগারে এক বছর বা তারও বেশি সময় বন্দীজীবন কাটিয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে জামিন দেয়ার বিধান রয়েছে। এই আইন যথাযথভাবে কার্যকর করতে পারলে বন্দীর সংখ্যা কমে আসবে অবশ্যই। উন্নত দেশগুলোর কারাগার মানে তা সংশোধনাগারও। সেখানে বন্দীরা মুক্ত জীবনের স্বাদ ছাড়া বাকি সবই ভোগ করতে পারেন। আর এদেশে স্বাধীন দেশের নাগরিকরা মানবতার এ ধরনের লাঞ্ছনা ভোগ করে, ভাবা যায় না। আমরা সরকার তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দেশের কারাগারগুলোর ভেতরের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর আহবান জানাই। একই সঙ্গে নিরাপরাধকেউ যাতে দিনের পর দিন আটক না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিচারব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর অনুরোধ জানাই।

পর্ব-দুই
অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার

০১. শিক্ষার অধিকার ও পরিস্থিতি

০২. স্বাস্থ্যের অধিকার

০৩. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার

০৪. ভোক্তা অধিকার পরিস্থিতি

শিক্ষা: অধিকার ও পরিস্থিতি

প্রতিটি মানুষের মৌলিক মানবাধিকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে শিক্ষার অধিকার। মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্ত বিনোদন অন্যতম বিষয়। খাদ্য ছাড়া মানুষ যেমন বাঁচতে পারেনা তেমনি শিক্ষা ব্যতীত সামাজিক জীব মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনা। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ যেমন তার নিজেকে এবং বিশ্বকে জেনে নিজেকে মানুষ রূপে প্রকাশ করে তেমনি পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারে। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি ততই উন্নত। তাই বলা হয়ে থাকে শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষালাভের সুযোগ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মেয়েদের ভর্তি এবং উপস্থিতি এমন একটা পর্যায় পৌঁছেছে যে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ লিঙ্গ সমতা অর্জনের দাবি করতে পারে। অধিক হারে শিশুরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে, নতুন নতুন স্কুল তৈরি হচ্ছে এবং আরো নতুন নতুন সমাজকর্মী এবং এনজিও এ প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে। কিন্তু এতে আত্মপ্রসাদ লাভ করার কিছু নেই। রাষ্ট্র পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে নিম্নমানের সাধারণ শিক্ষা, শিক্ষকদের বড় অংশ কর্তৃক প্রাইভেট কোচিংয়ের চর্চা; বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় সমাজ সম্পৃক্ততার অভাব এবং সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত পরিচালন-ব্যবস্থার কারণে অবস্থার ক্রমান্বয়ে অবনতি ঘটছে।

আন্তর্জাতিক ঘোষণা

- ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে প্রত্যেকেরই শিক্ষার অধিকার রয়েছে। শিক্ষা হবে বিনামূল্যে, অন্ততপক্ষে প্রাথমিক এবং মৌলিক পর্যায়ে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক।
- ১৯৯০ সালে ইউনেস্কো আয়োজিত World Declaration on Education for All-এ অঙ্গীকার করা হয় যে, ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে।
- শিশু অধিকার সনদের ২৮নং অনুচ্ছেদে সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে।
- ২০০০ সালের ঢাকা ঘোষণায় বলা হয় যে, ২০১৫ সালের মধ্যে সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে।
- ২০০০ সালের জাতিসংঘ সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছে ২০১৫ সালের মধ্যে সকল বালক-বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করবে।

সরকারি নীতি ও সংবিধানে শিক্ষার অধিকার

- সংবিধানের ১৫ (ক) ধারায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।
- সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

ক: একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করা হবে। যেখানে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরাও অন্তর্ভুক্ত।

খ: সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য।

গ: আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

Sustainable Development Goals 2030
বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০

লক্ষ্যমাত্রা-০১	সব খানে সকল প্রকার দারিদ্র দূরীকরণ;
লক্ষ্যমাত্রা-০২	ক্ষুধা দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টি উন্নয়ন এবং কৃষির টেকসই উন্নয়ন;
লক্ষ্যমাত্রা-০৩	সব বয়সের সকলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-মান নিশ্চিতকরণ;
লক্ষ্যমাত্রা-০৪	সকলের জন্য ন্যায্যতাভিত্তিক ও মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং সারা জীবনব্যাপী সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ;
লক্ষ্যমাত্রা-০৫	সকল নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা অর্জন;
লক্ষ্যমাত্রা-০৬	সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন এর টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ;
লক্ষ্যমাত্রা-০৭	সকলের জন্য সহজলভ্য, সুবিধাজনক, নির্ভরযোগ্য, টেকসই এবং আধুনিক শক্তি উৎসের সংস্থান করা;
লক্ষ্যমাত্রা-০৮	টেকসই ও অংশগ্রহণমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ এবং পূর্ণকালীন চাকুরী ও মর্যাদাপূর্ণ কর্ম পরিবেশ তৈরি করা;
লক্ষ্যমাত্রা-০৯	সহনশীল অবকাঠামো তৈরি, সকলের জন্য টেকসই শিল্পায়ন উন্নয়ন এবং নতুন নতুন উদ্ভাবন করা;
লক্ষ্যমাত্রা-১০	রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আভ্যন্তরীণ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণ;
লক্ষ্যমাত্রা-১১	সকল প্রকার মানব বসতি ও শহরগুলোকে সকলের জন্য উপযোগী, মনোরম ও টেকসইকরণ;
লক্ষ্যমাত্রা-১২	উৎপাদন এবং ভোগ কাঠামোর মধ্যে স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ;
লক্ষ্যমাত্রা-১৩	জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব মোকাবিলায় দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণ;
লক্ষ্যমাত্রা-১৪	সাগর, মহাসাগর, সামুদ্রিক প্রাণী এবং সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
লক্ষ্যমাত্রা-১৫	স্থলভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, বনাঞ্চলের টেকসই ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ কমানো, জমির ক্ষয়রোধকরণ ও জীব-বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি কমানো;
লক্ষ্যমাত্রা-১৬	শান্তিপূর্ণ ও সকলের জন্য অংশগ্রহণমূলক সমাজ বিনির্মাণ ত্বরান্বিতকরণ, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিকরণ, সকল স্তরে সকলের জন্য কার্যকরী, জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা;
লক্ষ্যমাত্রা-১৭	টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের জোরদারের মাধ্যমে উপরোল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ;

উপরোক্ত লক্ষ্যমাত্রাগুলোর মোট ১৬৯টি টার্গেট বা নির্দেশক স্থির করা হয়েছে যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করতে হবে। জানুয়ারি ২০১৬ সাল এগুলি কার্যকর হবে।

সরকারি গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশ ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এরপর থেকে বাংলাদেশ সরকার সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন-

- ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- ১৯৯৩ সালে শিক্ষার্থীর ভর্তি, উপস্থিতি ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি চালু হয়েছে, যা পরবর্তীকালে স্কুল উপবৃত্তি কার্যক্রম হিসেবে চালু রয়েছে।
- ২০০০ সালের এমডিজি ও ঢাকা ঘোষণাকে সামনে রেখে দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়।
- PEDP প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধির জন্যও কাজ করছে।
- জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্ধ বাড়ানো হয়েছে। সরকারের সার্বিক ব্যয়ের ১৪ শতাংশ হলো শিক্ষা খাতের ব্যয়।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা আনয়নের জন্য গ্রাম পর্যায়ের মেয়ে শিশুদের জন্য এসএসসি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ, ঝরেপড়া প্রতিরোধ এবং স্কুলে শিশুদের উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্য কমিউনিটিকে সচেতন করার পাশাপাশি সম্পৃক্তকরণে কমিউনিটি ভিত্তিক স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠিত হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০

- ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা। এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো-
- নতুন শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ বাড়িয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করা হয়েছে। পূর্বে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। এখন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।
- প্রথমবারের মতো নতুন শিক্ষানীতিতে প্রাক-শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর কথা বলা হয়েছে। ৫ বছরের শিশুরা ১ বছরের জন্য এই কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হবে।
- আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা চালুর কথা বলা হয়েছে।
- নতুন শিক্ষানীতিতে কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দেয়া হয়েছে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা শেষ হওয়ার পর যে কেউ কারিগরি শিক্ষায় যেতে পারে।
- সব স্তরে একই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির কথা বলা হয়েছে।

নানা শিক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা সবক্ষেত্রেই বিভাজিত শিক্ষা চালু আছে। এদেশে প্রায় ১২ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। যেমন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্ট্যার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ী মাদ্রাসা, পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন স্কুল, ইংলিশ মিডিয়াম, এবতেদায়ী পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুন্নি মাদ্রাসা ও কিন্ডার গার্টেন মাদ্রাসা। এছাড়া লিমিটেড কোম্পানি নামে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে 'এ লেভেল' 'ও লেভেল' স্কুল ও কোচিং সেন্টার। এগুলো লিমিটেড কোম্পানি নামে রেজিষ্ট্রিকৃত।

গাইবান্ধা শিক্ষা ব্যবস্থার হালচাল

গাইবান্ধা জেলায় ১৯৫১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ষাট বছরে স্বাক্ষরতার হার ১৬.১৫% থেকে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৭৫%-এ। কিন্তু জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক সংকট নিরসন ও মানোন্নয়ন আজও সম্ভব হয়নি। শ্রেণীকক্ষ ও বিদ্যালয়ে পাঠদান পদ্ধতি এখনও দায়সারা এবং প্রাইভেট ও অর্থ বাণিজ্যে আটকা পড়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা।

এ জেলার শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো হচ্ছে: ভৌত অবকাঠামোর সংকট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান সমস্যা শিক্ষক স্বল্পতা। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এতদিন ডোনেশন গ্রহণ করে সঠিক যাচাই বাছাই ছাড়াই শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। ফলে মেধাবী, সুশিক্ষিত, কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষকের অভাবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে না। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান অর্জন কোনক্রমেই সম্ভব হচ্ছে না। মাদরাসাগুলোতে অবস্থা আরো ভয়াবহ। সুষ্ঠু শিক্ষাই শুধু নয় সেখানে ঠিকমত ক্লাশও হয় না। বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং প্রকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নিয়েও সেখানে রয়েছে কারচুপি।

সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতেও বিদ্যালয় পর্যায়ে সঠিক লেখাপড়া হচ্ছে না। কারণ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞানকেন্দ্রিক না হয়ে অর্থকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। আর এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা এখন শিক্ষাকে বাণিজ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের পরিবর্তে তারা নিজের বাসা বাড়িতে খুলে বসেছে প্রাইভেট বাণিজ্য কেন্দ্র। বিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে না, তাই এ জেলার ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় পাশ করতে সংগত কারণেই বাধ্য হচ্ছে স্কুল শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে। নয় তো কোচিং সেন্টারের দারস্থ হতে।

অন্যান্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব, লেখাপড়ার মান যাচাইয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ না করা, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির তৎপরতা ও মনিটরিং এর অভাব। বিদ্যালয় ও মাদরাসাগুলোতে বসার বেঞ্চের সংকট। বৈদ্যুতিক আলো, ফ্যান না থাকায় অন্ধকার এবং দুঃসহ গরমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসে শ্রেণিকক্ষে লেখাপড়া। এছাড়া পর্যাপ্ত কম্পিউটার শিক্ষা, পাঠাগার না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে জ্ঞানচর্চার সুযোগ থেকে।

ঘাঘট, তিস্তা, করতোয়া, যমুনা নদীবেষ্টিত ৭টি উপজেলা নিয়ে গঠিত ২ হাজার ১শ' ৭৯ বর্গকিলোমিটার আয়তনের গাইবান্ধা জেলার ৬৫ বর্গ কিলোমিটার চরাঞ্চল। সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা, সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলার ২০টি ইউনিয়নের ১শ' ৩০টি চরাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থা নানা সমস্যায় বিপর্যস্ত। প্রাথমিক, মাদরাসা ও শিক্ষা সীমিত পর্যায়ে সুযোগ থাকলেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার সুযোগ চরাঞ্চলে নেই। এছাড়া চরাঞ্চলের মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থা, দারিদ্র্য, খাদ্য সংকট, পারিবারিক অভাব মেটাতে শিশুদের শ্রমে নিয়োজিত হওয়াসহ নানাবিধ কারণে চরাঞ্চলের শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে এতদাঞ্চলের বিশাল প্রান্তিক জনগোষ্ঠী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা এখানে নির্বাসিত। জেলার মূল ভূখ- থেকে বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলের বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা মূল সমস্যাগুলো হচ্ছে: শিক্ষক সংকট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বর্তমান অনুপাত ১:৪৪। গ্রাম ও প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে অবস্থা আরো ভয়াবহ। অনুপাত নয় ১ জন ২ জন শিক্ষক দিয়ে গোটা বিদ্যালয় চলে। চরাঞ্চলে নদী ভাঙনে বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হওয়ায় লেখাপড়া বিঘ্নিত। এছাড়া শিক্ষক স্বল্পতা, বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় শিক্ষকদের অবস্থান না করে মেইনল্যান্ড থেকে গিয়ে অনিয়মিত এবং স্বল্প সময়ে শিক্ষকতা। এছাড়া বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি নিষ্ক্রিয়তা, অভিভাবকদের দারিদ্র্য ও অসচেতনতা, শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা ও বদলি শিক্ষক প্রবণতা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিবিড় পর্যবেক্ষণের অভাব ও উদাসীনতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া এবং শিক্ষকদের সদিচ্ছার অভাব অন্যতম প্রধান কারণ।

জেলা শিক্ষা অফিস, গাইবান্ধা

এটি মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে জেলা পর্যায়ের প্রধান অফিস। অত্রাফিসের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের সকল স্কুল, স্কুল এন্ড কলেজ এবং মাদরাসার শিক্ষক-কর্মচারীগণের এমপিও-বেতন স্কেল পরিবর্তন সংক্রান্ত যাবতীয় আবেদন এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় আবেদন অগ্রায়ন/নিষ্পত্তি এবং প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক সমস্যার সমাধান ও সার্বিক মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

জেলা শিক্ষা অফিসের সিটিজেন চার্টার

১. মাধ্যমিকস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রেরণ।
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-কর্মচারীগণের বিভিন্ন প্রকার আবেদন অগ্রায়ন নিষ্পত্তিকরণ।
৩. পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণে শিক্ষক প্রেরণ ও মনিটরিং।

৪. সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রকল্প কর্তৃক পরিচালিত ছাত্র উপবৃত্তি, এসবিএ, পিবিএম, সিকিউ, আইসিটির মাধ্যমে শ্রেণি পাঠদান ইত্যাদি বাস্তবায়ন তদারকি।

৫. এনসিটিবি কর্তৃক সরবরাহকৃত বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তত বিতরণ, শিক্ষক নিবন্ধন সনদ বিতরণ ও তদারকি।

৬. পরিদর্শন পরবর্তী তথ্য ও জরিপ ফরম অনলাইনে এন্ট্রিকরণ।

৭. মাধ্যমিকস্তরে শিক্ষার মান উন্নয়নে নিয়মিত মনিটরিং ও পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ।

৮. ইত্যাদি সেবা পেতে সরকারি কার্যদিবসের সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টার মধ্যে যে কোন সময় অফিসে উপস্থিত হয়ে আবেদন দাখিল করতে হয়। সেবা পেতে কোন রকম ফি প্রদান করতে হয় না।

গাইবান্ধা জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার তথ্য

উপজেলার নাম	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (পাঠদানের অনুমতি আছে এমনপ্রতিষ্ঠানসহ)											
	স্কুল				স্কুল এন্ড কলেজ			কলেজ			মাদরাসা	
		সরকারি	বেসরকারি		সরকারি	বেসরকারি		সরকারি	বেসরকারি		এমপিও ভুক্ত	এমপিও বিহীন
			এমপিও ভুক্ত	এমপিও বিহীন		এমপিও ভুক্ত	এমপিও বিহীন		এমপিও ভুক্ত	এমপিও বিহীন		
গাইবান্ধা সদর	মাধ্যমিক	০২	৩৯	০৫	--	০১	০২	০২	০৩	০১	১৮	০২
	নিম্ন মাধ্যমিক	--	১৫	০২	--							
সুন্দরগঞ্জ	মাধ্যমিক	০২	৫৬	--	--	০২	০১	--	০৭	০৫	৪২	০৬
	নিম্ন মাধ্যমিক	--	১৫	০৯	--							
পলাশবাড়ী	মাধ্যমিক	--	২৮	--	--	০১	--	০১	০৪	০১	১৯	০৩
	নিম্ন মাধ্যমিক	--	১৫	--	--							
সাদুল্লাপুর	মাধ্যমিক	--	৫৩	--	--	০২	০৪	--	০৮	০৫	৩৭	০৮
	নিম্ন মাধ্যমিক	--	০৩	০৫	--							
গোবিন্দগঞ্জ	মাধ্যমিক	--	৬৫	--	--	০১	০২	--	০৮	--	৫৫	০৯
	নিম্ন মাধ্যমিক	--	১২	০৫	--							
সাঘাটা	মাধ্যমিক	--	৩১	--	--	০২	--	--	০৪	০১	১৩	০৮
	নিম্ন মাধ্যমিক	--	০৫	০৩	--							
ফুলছড়ি	মাধ্যমিক	--	১২	--	--	০১	--	--	০২	০৩	০৭	--
	নিম্ন মাধ্যমিক	--	০৩	--	--							
	সর্বমোট=	০৪	৩৫২	২৯	--	১০	০৯	০৩	৩৬	১৬	১৯১	৩৬

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তথ্য

উপজেলার নাম	প্রধান শিক্ষক			সহকারী শিক্ষক		
	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদ	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদ
গাইবান্ধা সদর	১৩৬	১১৫	২১	৬৪৭	৫৯৭	৫০
সুন্দরগঞ্জ	১৪০	১১৩	২৭	৬৫৩	৬১৮	৩৫
সাদুল্লাপুর	৯০	৭৩	১৭	৩৬৯	৩৩৯	৩০
পলাশবাড়ী	৮৪	৬৫	১৯	৩২৫	৩০০	২৫
গোবিন্দগঞ্জ	১৫৩	১২৫	২৮	৬৮৪	৬২৬	৫৮
ফুলছড়ি	৪৯	৩৭	১২	২১৮	২০৩	১৫
সাঘাটা	৮৫	৬২	২৩	৪১০	৩৮৯	২১

মোট=	৭৩৭	৫৯০	১৪৭	৩৩০৬	৩০৭২	২৩৪

উপজেলাভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি, উপবৃত্তি, পাশ ও ঝরে পড়ার হার

উপজেলা	বালক	বালিকা	উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী	পাশের হার	ঝরে পড়ার হার
গাইবান্ধা সদর	৩৯৫০১	৪১০০৯	৩৬৮১০	৯৯.৯১%	১০.৪৩%
সুন্দরগঞ্জ	৫০৩০০	৪৯৮০০	৬৬৩৮৯	৯৯.৭১%	৭.২২%
সাদুল্লাপুর	২১৭৪৯	২১৩৪০	৩৬৫০৭	৯৬.৬০%	৯.৭২%
পলাশবাড়ী	২৪০২৭	২৩২০৩	৩৫২৫৬	৯৭.৫৮%	৭.১৪%
গোবিন্দগঞ্জ	৪৩৫১৬	৪৬২৫৯	৫৪৬২০	৯৯.৫১%	১০.৩১%
ফুলছড়ি	১২৮০১	১২৮৯০	১৮৭৮৫	৯৯.৪৬%	৭.০১%
সাঘাটা	৩১৫২০	৩০৩৫৭	৩৬৬০০	৯৯.০৪%	৭.২৭%
মোট=	২২৩৪১৪	২২৪৮৫৮	২৮৪৯৬৭	৯৮.৮১%	৮.৮২%

উপজেলাভিত্তিক বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথ্য

উপজেলার নাম	সরকারি	সদ্য জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেসরকারি আন্তঃরেজি প্রাথমিক বিদ্যালয়	উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	কিন্ডার গার্টেন	এবতেদায়ী (স্বতন্ত্র)	এবতেদায়ী (উচ্চ মাদ্রাসাযুক্ত)	পিটিআই পরীক্ষণ বিদ্যালয়	কমিউনিটি বিদ্যালয়	এনজিও শিক্ষা কেন্দ্র	মোট
গাইবান্ধা সদর	১৩৬	৭৭	-	০১	৬১	০২	১৮	০১	০৪	৬৫	৩৬৫
সুন্দরগঞ্জ	১৪০	১৭০	-	-	৪৫	১১	৪৩	-	-	৬৫	৪৭৪
সাদুল্লাপুর	৯০	১০৭	-	০২	১৯	০৩	১৯	-	-	২৬	২৬৬
পলাশবাড়ী	৮৪	১২৭	-	০১	২১	০৯	৩৬	-	-	০৩	২৮১
গোবিন্দগঞ্জ	১৫৩	১১৯	-	১০	৭০	০৯	৫৫	-	-	০৬	৪২২
ফুলছড়ি	৪৯	৬৭	-	-	০৭	০৮	১৩	-	-	৮২	২২৬
সাঘাটা	৮৫	৮৫	-	-	২৭	--	০৭	-	-	১২৬	৩৩০
মোট=	৭৩৭	৬৯০	-	১৪	২৫০	৪২	১৯১	০১	০৪	৩৭৩	১৫৬৫

উপজেলাভিত্তিক উপবৃত্তি প্রাপ্তি ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা, এসএসসি পরীক্ষা/১৫ ফলাফল এবং শিক্ষক/শিক্ষিকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য

গাইবান্ধা সদর উপজেলা

স্তর	উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র সংখ্যা	উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী সংখ্যা	উপবৃত্তি প্রাপ্ত মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা
মাধ্যমিক	২৪১৭ জন	৫৫১০ জন	৭৯২৭ জন
উচ্চ মাধ্যমিক	১৩৪ জন	৫৪৩ জন	৬৭৭ জন
স্নাতক	৪০ জন	৬৭২ জন	৭১২ জন

এসএসসি পরীক্ষা/১৫ এর ফলাফল

স্তর	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ	পাশের হার	জিপিএ-৫প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা
মাধ্যমিক	৩৩৫৮ জন	২৯৮৬ জন	৮৮.৯২%	৩৩৪ জন

শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা ঃ

স্তর	শিক্ষকের সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী
মাধ্যমিক	৮৫৮ জন	৭১৬ জন	১৪২জন	৩২২৩৪ জন	১৫৮৮৭ জন	১৬৩৪৭ জন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ঃ

নিম্ন মাধ্যমিক	মাধ্যমিক	কলেজ	ডিগ্রী	অনার্স	মাদ্রাসা	দাখিল	আলিম	ফাজিল	কামিল
০৭	৬১	০৮	০৫	০১	২০	১৫	০৩	০২	-

সাঘাটা উপজেলা

স্তর	উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র সংখ্যা	উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী সংখ্যা	উপবৃত্তি প্রাপ্ত মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা
মাধ্যমিক	৭২০০জন	৭২৮৯ জন	১৪৫৭৭ জন
উচ্চ মাধ্যমিক	৭৪ জন	৪০২ জন	৪৭৬ জন
স্নাতক	৪০ জন	৬৭২ জন	৭১২ জন

এসএসসি পরীক্ষা/১৫ এর ফলাফল

স্তর	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ	পাশের হার
মাধ্যমিক	২০১৮ জন	১৭০৪ জন	৮৪.৪৪%

শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা

স্তর	শিক্ষকের সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী
মাধ্যমিক	১০৯২ জন	৮৩৬ জন	২৫৬জন	১৪৪৬২ জন	৭২০৩ জন	৭২৫৯ জন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা

নিম্ন মাধ্যমিক	মাধ্যমিক	কলেজ	অনার্স	ডিগ্রী	মাদ্রাসা	দাখিল	আলিম	ফাজিল	কামিল

০৪	৪০	০২	০১	০৩	১৯	১৭	০১	০১	-

সাদুল্যাপুর উপজেলা

স্তর	উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র সংখ্যা	উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী সংখ্যা	উপবৃত্তি প্রাপ্ত মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা
মাধ্যমিক	১৩২৯ জন	৪০১৩ জন	৫৩৪২ জন
উচ্চ মাধ্যমিক	২১৯ জন	৯১২ জন	১১৩১ জন
স্নাতক	২৬ জন	৫৮৯ জন	৬১৫ জন

এসএসসি পরীক্ষা/১৫ এর ফলাফল

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ	পাশের হার	জিপিএ-৫
২০৩০ জন	১৮০৬ জন	৮৮.৯৭%	৬৩ জন

শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা

শিক্ষকের সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী
১৬৮১জন	১৩২৪ জন	৩৫৭ জন	৪১৬৫০ জন	২১৭৮০ জন	১৯৮৭০ জন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা

নিম্ন মাধ্যমিক	মাধ্যমিক	কলেজ	ডিগ্রী	অনার্স	মাদ্রাসা	দাখিল	আলিম	ফাজিল	কামিল
০৮	৫৩	---	০৪	---	---	৩৮	০৫	০৪	---

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা

স্তর	উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র সংখ্যা	উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী সংখ্যা	উপবৃত্তি প্রাপ্ত মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা
মাধ্যমিক	২৩৪৮ জন	৭১১৯ জন	৯৪৬৭ জন
উচ্চ মাধ্যমিক	৫২০ জন	১৬১৪ জন	২১৩৪ জন
স্নাতক	১১১ জন	১৪৩৭ জন	১৫৪৮ জন

এসএসসি পরীক্ষা/১৫ এর ফলাফল

স্তর	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ	পাশের হার	জিপিএ-৫প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা
মাধ্যমিক	৩১৫০ জন	২৯৫০ জন	৯৪%	২৬৫জন

শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা

স্তর	শিক্ষকের সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী
মাধ্যমিক	২০৩৩ জন	১৬১৬ জন	৪১৭ জন	৩০৫২৪ জন	১৪৫০২ জন	১৬০২২ জন

স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা

নিম্ন মাধ্যমিক	মাধ্যমিক	কলেজ	ডিগ্রী	অনার্স	মাদ্রাসা	দাখিল	আলিম	ফাজিল	কামিল
০৮	৭৫	১৫	০৫	--	৫৯	৪৪	০৭	০৭	০১

সুন্দরগঞ্জ উপজেলা

স্তর	উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র সংখ্যা	উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী সংখ্যা	উপবৃত্তি প্রাপ্ত মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা
মাধ্যমিক	১৮৪৪৮ জন	১৩০২০ জন	৩১৪৬৮ জন
উচ্চ মাধ্যমিক	৬৮৬ জন	১২০৮ জন	১৮৯৪জন

স্নাতক	১৯০ জন	১১২৮ জন	১৩১৮ জন

এসএসসি পরীক্ষা/১৫ এর ফলাফল

স্তর	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ	পাশের হার	জিপিএ-৫প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা
মাধ্যমিক	৩২২৫ জন	২৫৯৯ জন	৮০.৮৯%	১৮২জন
দাখিল	৮৮৯ জন	৭৭৬ জন	৮৭.২৯%	২৭ জন

শিক্ষক/শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা

শিক্ষকের সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী
২৭২৫	২৩৪৭	৩৭৮	---	---	---

স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা

নিম্ন মাধ্যমিক	মাধ্যমিক	কলেজ	ডিগ্রী	অনার্স	মাদ্রাসা	দাখিল	আলিম	ফাজিল	কামিল
০৯	৭৩	০৫	০৭	-	৪৮	৩৮	০৬	০৪	---

পলাশবাড়ি উপজেলা

স্তর	উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র সংখ্যা	উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী সংখ্যা	উপবৃত্তি প্রাপ্ত মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা
মাধ্যমিক	৩৭১৪ জন	৩৯৬৫ জন	৭৬৭৯ জন
উচ্চ মাধ্যমিক	১২৫৭ জন	১০১১ জন	২২৬৮ জন
স্নাতক	১৬৫ জন	২৪৪ জন	৪০৯ জন

এসএসসি পরীক্ষা/১৫ এর ফলাফল

স্তর	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ	পাশের হার	জিপিএ-৫প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা
মাধ্যমিক	২৬০০ জন	২৩০৪ জন	৮৮.৬১%	১৯৬জন

শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা

স্তর	শিক্ষকের সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী
মাধ্যমিক	৭৩৫জন	৪৬৫ জন	২৭০ জন	২২৩৫৩ জন	১১৪৩৫ জন	১০৯১৮ জন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ঃ

নিম্ন মাধ্যমিক	মাধ্যমিক	কলেজ	ডিগ্রী	অনার্স	মাদ্রাসা	দাখিল	আলিম	ফাজিল	কামিল
০৫	৩৯	০৪	০৪	---	১৮	১২	০১	০৫	---

ফুলছড়ি উপজেলা

স্তর	উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র সংখ্যা	উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী সংখ্যা	উপবৃত্তি প্রাপ্ত মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা
মাধ্যমিক	৯২২ জন	১৮৯১ জন	২৮১৩ জন
উচ্চ মাধ্যমিক	১২৮ জন	৫৫৬ জন	৬৮৪ জন
স্নাতক	১৯ জন	২৬১ জন	২৮০ জন

এসএসসি পরীক্ষা/১৫ এর ফলাফল

স্তর	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ	পাশের হার	জিপিএ-৫প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা
মাধ্যমিক	৬৬৯ জন	৪৯৪ জন	৭৩.৮৪%	২১জন

শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা

স্তর	শিক্ষকের সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী
মাধ্যমিক	২৩০জন	১৮৮জন	৪২জন	১০৯১৬ জন	৫৪২৬ জন	৫৪৯০ জন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা

নিম্ন মাধ্যমিক	মাধ্যমিক	কলেজ	ডিগ্রী	অনার্স	মাদ্রাসা	দাখিল	আলিম	ফাজিল	কামিল
০২	১৪	০২	০২	---	০৭	০৬	০১	--	--

শিক্ষার ক্ষেত্রে শারীরিক শাস্তি

হাইকোর্টের নির্দেশনা সাপেক্ষে পরিপত্র জারির মাধ্যমে মাদ্রাসাসহ দেশের সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষিকা কর্তৃক শিক্ষার্থীদের উপর শারীরিক শাস্তি আরোপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু তারপরও সারা জেলায় এধরনের ঘটনার পুণরাবৃত্তি হয়েছে। সারা দেশে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের উপর শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান এবং এরূপ শাস্তি আরোপ প্রতিরোধে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যর্থতাকে চ্যালেঞ্জ করে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় আদালত উপরোক্ত পরিপত্র জারির আদেশ প্রদান করে। সেই সাথে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘটে যাওয়া শারীরিক শাস্তি প্রদানের ঘটনায় কি ধরনের শাস্তি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা জানাতে সরকারকে নির্দেশ দেন আদালত। কিন্তু তারপরেও গাইবান্ধা জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাস্তি প্রদানের ঘটনা উঠে এসেছে পত্রিকান্তরে। ৮ মার্চ ২০১৫ তারিখে 'দৈনিক ঘাঘট; পত্রিকায় প্রকাশিত 'সুন্দরগঞ্জে শিক্ষক কর্তৃক ৩য় শ্রেণির ছাত্রকে মারপিট' শীর্ষক সংবাদ শিরোনামের ঘটনাটি ছিল এমন–

উপজেলার ছাইতানতলা উদয়ন প্রিপারেটরি স্কুলে বৈদ্যনাথ গ্রামের সাজু মিয়ার পুত্র ফারহান সাদিক সৈকত (৯) তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র শিক্ষক কর্তৃক বেধড়ক মারপিটে গুরুতর অসুস্থ হয়ে নিজে বাড়িতে কাতরাচ্ছেন। গত ২ মার্চ ক্লাশ শিক্ষক আনারুল ইসলাম ক্লাশে গিয়ে পড়ালেখা না হওয়ার অজুহাতে সৈকতকে ডেকে নিয়ে এলোপাথারী মারপিট শুরু করে। এতে সে অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে তার বাড়িতে রাখা হয়। এ ঘটনায় উদয়ন প্রিপারেটরি স্কুলের পরিচালক মতিয়ার রহমানের সাথে কথা হলে তিনি ঘটনাটি স্বীকার করেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি

গাইবান্ধা জেলায় শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা ধরনের দুর্নীতি দেখা গেছে। যেমন ১৮ মে ২০১৫ তারিখে 'দৈনিক ঘাঘট' পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ' শীর্ষ সংবাদ শিরোনামের ঘটনাটি ছিল এমন–

সাঘাটা উপজেলা পাছ গড়গড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগে প্রকাশ উপজেলার কামালেরপাড়া ইউনিয়নের পাছ গড়গড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ইতিপূর্বে রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকাকালীন প্রধান শিক্ষক লুৎফর রহমান সপ্তাহে ২/৩ দিন বিদ্যালয়ে এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে চলে যেত। স্কুলে নিয়মিত আসার বিষয়টি নিয়ে অভিভাবকগণ অভিযোগ করলে তিনি বেতন ভাতা কম পান এ অজুহাত দিত। এদিকে বিদ্যালয়টি সরকারিকরণ করা হলেও প্রধান শিক্ষক লুৎফর রহমান অনিয়মিত এবং বিলম্বে বিদ্যালয়ে আসেন। ফলে একদিকে যেমন সহকারি শিক্ষকদের পাঠদানে অমনোযোগীতা থাকে অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যহত হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

শিক্ষানুরাগী জনৈক ব্যক্তি জানায়, উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা স্লিপের টাকা উত্তোলন করে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছেন। অথচ প্রধান শিক্ষক লুৎফর রহমান স্লিপের ১৫ হাজার টাকা উত্তোলন করলে কাজ না করে তা আত্মসাতের পায়তারা করছেন।

২৫ আগস্ট ২০১৫ দৈনিক ঘাঘট 'সাদুল্যাপুর মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্যসহ বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির তদন্ত' শীর্ষক সংবাদ শিরোনামের ঘটনাটি ছিল এমন–

সাদুল্যাপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এইচ.এম মাহবুবুল ইসলামের বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্যসহ বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত গত রোববার অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. কুতুব উদ্দিন সাদুল্যাপুর বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে এ তদন্ত কাজ সম্পন্ন করেন। এসময় উপজেলার অভিযোগকারী ৩৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান (মাদ্রাসার সুপার ও হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক) উপস্থিত ছিলেন। জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত ২০ আগস্টের স্মারক নং-জে/শি-গা/২০১৫/৯৯৫ এর এক পত্রে জানা যায়, উপজেলার ৩৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ওই শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির নানা অভিযোগ করেন। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে এ তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়। তদন্তকালে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান জানান, শিক্ষক নিয়োগে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা না দিলে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ওই নিয়োগ কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন না। তারা আরো জানান, সরকারের বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রদান কার্যক্রমে পরিবহন খরচ বাবদ তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে থাকেন। যা নিয়ম বহির্ভূত। তিনি ইন্ধন দিয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি ও প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে ফায়দা লুটে থাকেন। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত উপজেলার একাধিক মাদ্রাসায় পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী থাকা সত্ত্বেও বর্তমান এবছর তিনি কোন পাঠ্যবই প্রদান করেননি। এসব কারণে উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়ার স্বাভাবিক পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে সাদুল্যাপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এইচ এম মাহবুবুল ইসলাম তদন্ত কার্যক্রমে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, বিভিন্ন সময় অনিয়মের কারণে ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার কারণে তারা তার বিরুদ্ধে এ মিথ্যা অভিযোগ করেছেন।

কোচিং বাণিজ্য

গাইবান্ধা জেলায় বিদ্যালয়ের পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষকরা ও বিভিন্ন পেশাদারী ছাত্ররা কোচিং বাণিজ্য করে চলেছে। দেখা যায় গণিত, ইংরেজি, পদার্থ বিজ্ঞানসহ বিজ্ঞান শাখার অন্যান্য বিষয়ের উপর ব্যক্তি-মালিকানাধীন এইসব প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করা হয়। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, 'শ্রেণীকক্ষে মানসম্পন্ন পাঠদান না করা, শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতার অভাব, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষকের সংকট ইত্যাদির কারণে স্থানীয়ভাবে এইসব কোচিং প্রতিষ্ঠান ব্যবসা করে যাচ্ছে। শিক্ষা একটি বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হচ্ছে। এর ফলে দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মূলত কিন্ডারগার্টেন-এ পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা এই ধরনের কোচিং প্রতিষ্ঠান হতে সহায়তা নেন। আবার জানা গেছে কিন্ডারগার্টেনে যেসকল শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন তাদেরকে বর্তমান বাজার ব্যবস্থার তুলনায় অনেক কম বেতন প্রদান করা হয়। প্রকারন্তে পরোক্ষভাবে এই সকল শিক্ষকরা কোচিং বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়েন। শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং মান সম্পন্ন শিক্ষার জন্য জেলা উন্নয়ন কমিটির বিভিন্ন সভায় কোচিং বাণিজ্য বন্ধে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও কার্যত এর ফলপ্রসূতা দৃশ্যমান হয়নি। আবার বর্তমানে সৃজনশীল শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকলেও বাজারে নোট বইয়ের ছড়াছড়ি রয়েছে।

নোটবই গাইড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আপিল বিভাগের রায়

১৯৮০ সালে নোটবই মুদ্রণ, প্রকাশ, আমদানি, বিতরণ ও বিক্রি নিষিদ্ধ করে একটি আইএ পাস করা হলেও তাকে সামান্যই পরোয়া করেছেন পুস্তক ব্যবসায়ীরা। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ একরায়ে নোটবই ও গাইডকে ২০০৮ সালে চূড়ান্তভাবে বেআইনি ঘোষণা করেছে।

জেলার শিক্ষা পরিস্থিতির বাস্তবতা ও এর উন্নয়নের সুপারিশ

- চরের শিক্ষকদের জন্য বিশেষ চর ভাতা, স্কুলের সঙ্গে বাসস্থান এবং স্থানীয় শিক্ষকের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা। প্রক্সি শিক্ষক দিয়ে পাঠদান ব্যবস্থা বন্ধ করা। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের দুপুরের খাবার দিতে হবে।
- বড় বড় নৌকার মাধ্যমে ভাসমান স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে। যেগুলো সকালে এক চরে ৩/৪ ঘন্টা, পাঠদানের পরে বিকালে আরেক চরে ৩/৪ ঘন্টা থাকতে পারে। নৌকার মধ্যে পাঠদানের সকল উপকরণ, শিক্ষকের বাসস্থান, খাদ্য এবং নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।
- ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে চরের সকল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উৎসাহ বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। চরে ১০০% উপবৃত্তি প্রদান করতে হবে। মূল ভূখন্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে চরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কোটা ও সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত করতে হবে।
- নদী ভাঙ্গনের ফলে স্কুল বিনষ্ট হয়ে যায় বিধায় পর্যাপ্ত ফ্লাড শেল্টার কাম স্কুলের ব্যবস্থা করা।
- সরকারি শিক্ষা কর্মকর্তাদের চরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন নিশ্চিত করা।
- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদের সংখ্যা বৃদ্ধি।
- উপজেলা পর্যায়ে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের জন্য অনুমোদিত শূন্যপদগুলো পূরণ করা প্রয়োজন।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উচ্চমান সহকারী কম্পিউটার অপারেটরের শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া।
- স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করা।
- প্রতিটি স্কুলের শিক্ষক-এসএমসি ও অভিভাবকের দ্বন্দ্ব নিরসন করে শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুই শিফটের পরীক্ষাগুলো এক শিফটে আনয়ন করা।
- শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষা কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পজেটিভ করা।
- বাংলাদেশের প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে পিয়ন ও একজন নাইটগার্ড নিয়োগ করা।
- সরকারের বিভিন্ন জরীপ কাজে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ না করানো।
- শিক্ষার্থীকে ক্লাসে নিয়মিত রাখার জন্য সরকার ফিডিং কার্যক্রমকে আরো বৃদ্ধি করতে পারে।
- শিক্ষকগণ ক্লাসে সঠিক সময়ে আসবেন।
- মনিটরিং জোরদার করার জন্য উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসারদের পর্যাপ্ত জ্বালানী ও যাওয়া আসার ভাতার ব্যবস্থা জরুরি।
- বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকদের সকল শূন্যপদ পূরণ করতে হবে এবং ৩য় ও ৪র্থ পদ বিশিষ্ট বিদ্যালয়কে ৫ পদে উন্নীত করতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষের সংকট দূর করার জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন দরকার, দূর্ঘটনা রোধকল্পে পুরাতন ভবনগুলোর দ্রুত মেরামত প্রয়োজন।
- প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে কমপক্ষে স্নাতক বা ডিগ্রি সম্পন্ন সকল শিক্ষক নিয়োগ, উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান, প্রধান শিক্ষকের ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ পদমর্যাদা দেওয়া।
- ১০০% উপবৃত্তি প্রদান করা, শিক্ষকদের হাওর ভাতা প্রদান, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনুপাত ২৫:১ শ্রেণিকক্ষের করে ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে শিক্ষকেরা ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহ পরিদর্শন করতে পারেন।
- বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ধনী গরীবের বৈষম্য বিরাজমান তা বাতিল করে একমুখী শিক্ষার আওতায় সবাইকে আনতে হবে।
- অধিকাংশ স্কুলের শৌচাগারে সমস্যা, কোথাও কোথাও নেই, এসব সমস্যার দ্রুত জেলা ও উপজেলায় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কোন বাজেট শিক্ষা সপ্তাহের খরচ, সুষ্ঠুভাবে উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ দেয়া।
- কন্টিনজেন্সি টাকার পরিমাণ বাড়ানো, শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার জন্য সরকারিভাবে খেলাধুলার উপকরণ সরবরাহ করা।
- গাইবান্ধা জেলার প্রতিটি বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি প্রদান করা।

- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ের উঠার জন্য র‍্যাম্পিং, টেবিল ও পড়ানোর জন্য আলাদা শিক্ষক নিয়োগ করা।
- জ্ঞান ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সুষ্ঠুভাবে মান সম্মত শিক্ষক নিয়োগ করা।
- শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সকল প্রকার শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা হলেও বহু শিক্ষার্থী পড়াশোনায় অমনোযোগিতা ও নেতিবাচক আচরণের জন্য শারীরিক শাস্তি পায়। এতে বহু সংখ্যক শিক্ষার্থীর নিজেদের উন্নয়নের চেষ্টা না করে নিরুৎসাহিত হয়ে স্কুল ত্যাগ করে এবং বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের শারীরিক শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন এবং কার্যকর পদক্ষেপের সাহায্যে নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভুল মানসকিতা ও অভ্যাস উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত।
- স্কুল কলেজ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের অনিয়ম ও দুর্নীতি মুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি কার্যক্রমকে সরকারের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে মনে করা হয়। জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার শিক্ষক, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, অভিভাবকসহ সকলেই মনে করেন এই কার্যক্রমটি শিক্ষার মনোন্নয়নে অর্থাৎ শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি। পড়াশুনার মান বৃদ্ধি এবং স্কুল থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার অনেক কমিয়েছে। স্কুল পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থী এই উপবৃত্তি সুবিধার আওতাভুক্ত নয়। জেলার শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তির পরিমাণ আরো বাড়ানো দরকার। এই সুবিধাকে সবার জন্য বাধ্যতামূলক করলে এটি শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও বেগবান করবে।
- শিক্ষা বর্তমানে পণ্যে পরিণত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য, শিক্ষা প্রদান নিয়ে অবহেলা, শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য, বর্তমানে শিক্ষাকে দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে নিয়ে গেছে। বর্তমানে জেলা শহরে কোচিং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণও ক্লাসে সঠিকভাবে পাঠ দান না করে বাসায় ব্যাচ/কোচিং সেন্টার খুলে বাণিজ্য করছেন। জেলা শহরের কোচিং সেন্টারগুলো সারাদিন খোলা থাকে। এক্ষেত্রে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থেকে কোচিং সেন্টার সমূহে পড়ান কিনা তা কর্তৃপক্ষের ভালভাবে দেখা দরকার। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে সম্পৃক্তকরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনিয়ম দূর করা প্রয়োজন।
- বিশৃঙ্খলা, সহিংসতা ও দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।
- শিক্ষকদের জন্য আলাদা ও মর্যাদা পূর্ণ বেতন কাঠামো চালু ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণ।

সংবিধান এবং সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা ও কার্যক্রমে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, জেন্ডার, আঞ্চলিক অবস্থান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল শিশুকে একই ধরনের শিক্ষার আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার ৪২ বছরেও তা বাস্তবায়িত হয় নাই। সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রায় যে সবার জন্য শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, সেক্ষেত্রেও ১০০ ভাগ সফলতা আসেনি। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষাকে একক একটি ইস্যু হিসেবে দেখার কোনো সুযোগ নেই। সমগ্র আর্থ- সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিষয়টিকে মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষা যদি একটি জাতির মেরুদন্ড হয়, তাহলে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টিকে বিবেচনা করতে হবে।

শিক্ষার বিষয়টি শুধু প্রকল্পভিত্তিক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনা। এর জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণে জাতীয় পরিকল্পনা প্রয়োজন, যেখানে সরকার পরিবর্তনের সাঙ্গে সঙ্গেই পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন হবে না। বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমত থাকলেও শিক্ষা বিষয়ে একটি জাতীয় ঐকমত্য দরকার, তা না হলে সকলের জন্য একই ধরনের শিক্ষা প্রবর্তনের বিষয়টি শুধু কাগজে-কলমেই থেকে যাবে।

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে দারিদ্র্য একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে যুগ যুগ ধরে বিরাজমান। এক্ষেত্রে সমগ্র পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে একটি পরিপূর্ণ শিক্ষা প্যাকেজ তৈরি করতে হবে।

স্বাস্থ্যের অধিকার

পৃথিবীব্যাপী মানব উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসাবে স্বাস্থ্য স্বীকৃত এবং নূন্যতম স্বাস্থ্যসেবা পাওয়াকে একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে গণ্য করা হয় যা ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘে পাশ হওয়া সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ২৫ ধারায় বলা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চিকিৎসাসহ জীবনধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা অর্জন নিশ্চিত করার বিষয়টি রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। অতএব, বলা যায় সংবিধান ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদ অনুযায়ী জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন এবং বৈষম্য হীনভাবে জনগণের স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক বাধ্যবাধকতা।

বাংলাদেশের সংবিধানে স্বাস্থ্য অধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও আশ্রয়ের সাথে স্বাস্থ্যকে জীবনধারণের মৌলিক উপকরণ বলে চিহ্নিত করে এগুলোর ব্যবস্থা করার মৌলিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে (১৫ অনুচ্ছেদ)। অন্য এক অনুচ্ছেদে (১৮/১) জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিষয়ক এই দায়িত্বের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত নারী সমাজের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের কথাটি অবশ্য সংবিধানে অব্যক্তই থেকে গেছে। যদিও মৌলিক অধিকার ভাগের এক অনুচ্ছেদে 'ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে রাষ্ট্র কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করবে না' বলে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ-২৮/১)। ২৮/২ অনুচ্ছেদে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন'।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি'তে স্বাস্থ্যবিষয়ক অঙ্গীকার

গত ২০০০ সালে মিলেনিয়াম সামিটে গোটা বিশ্বের জন্য একটি সাধারণ লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি গৃহীত হয়। এতে মোট আটটি অগ্রাধিকার লক্ষ্য চিহ্নিত করা হয়, যা আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন করতে হবে। বিশ্বের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রতিটি দেশেই এই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে। এর ৮টি লক্ষ্যের মধ্যে ৩টিই হলো স্বাস্থ্যসংক্রান্ত। এখানে মোট ১৮টি লক্ষ্যমাত্রার ৯টি স্বাস্থ্যসংক্রান্ত এবং ৪৮টি নির্দেশকের মধ্যে ১৮টি স্বাস্থ্য বিষয়ে। এ থেকেই বোঝা যায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় স্বাস্থ্যকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

লক্ষ্য-৪: শিশু মৃত্যুহার কমিয়ে আনা

এ বিষয়ে **বৈশ্বিক লক্ষ্য:** ১৯৯০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনা।

বাংলাদেশে লক্ষ্য: ১৯৯০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার ১৫১ থেকে আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে হাজারে ৫০ জনে নামিয়ে আনা।

লক্ষ্য-৫: মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন

বৈশ্বিক লক্ষ্য: ১৯৯০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার তিন-চতুর্থাংশ কমিয়ে আনা।

বাংলাদেশে লক্ষ্য:

- মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি এক লাখে ৫৭.৩ থেকে কমিয়ে ২০১৫ সালের মধ্যে ১৪.২ শতাংশে নিয়ে আসা
- ২০১০ সালের মধ্যে দক্ষ ধাত্রীর সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীত করা
- ২০১০ সালের মধ্যে মোট জন্মহার ২.২-এ নামিয়ে আনা
- ২০১৫ সালের মধ্যে গর্ভকালীন অপুষ্টি ২০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা

- মেয়েদের বিবাহের গড় বয়স দুই বছর বৃদ্ধি করা
- নারীরপ্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করা।

গোল-৬: এইচআইভি/এইডস-এর বিস্তার রোধ এভং ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণ

বৈশ্বিক লক্ষ্য: ২০১৫ সালের মধ্যে এইচআইভি এইডস নিয়ন্ত্রণ করা

বাংলাদেশের লক্ষ্য: ২০১৫ সালের মধ্যে এইচআইভি এইডস নিয়ন্ত্রণ করা

বৈশ্বিক লক্ষ্য: ২০১৫ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য জটিল রোগের বিস্তার রোধ করা

বাংলাদেশের লক্ষ্য: ২০১৫ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়াজনিত কারণে মৃত্যুর হার ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনা।

কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য সেবা

সরকার ও স্থানীয় জনগোষ্ঠির অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনামূল্যে গ্রামীণ জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮ সালে গ্রামীণ জনগণের সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো চালু থাকলেও মানুষ ক্লিনিকে কি সেবা পাবে, কোন কোন দিন খোলা থাকে, খোলার সময় এবং বন্ধের সময় না থাকায় এবং সরকারিভাবে এর কোন প্রচার না থাকায় কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে মানুষ সেবা গ্রহণ করতে পারছে না। কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক থেকে মা ও শিশুদের জন্য যে ধরনের সেবা দেওয়া হচ্ছে তা স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত নয়। যথাযথ বাজেট বরাদ্দ না থাকা, বিশেষায়িত ডাক্তারের অভাব, উপকরণের অভাব ও সেবা কর্মীর অভাব অপর্যাপ্ত সেবা প্রদানের অন্যতম কারণ। স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন জন্য যে অবকাঠামো ও আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকা দরকার কমিউনিটি ক্লিনিকে তাও পর্যাপ্ত নয়। কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক থেকে যে সেবা দেওয়া হয় তা সেবা গ্রহীতারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পেয়ে থাকেন। কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিকে কোন এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা নেই। ক্লিনিকে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নেই। ক্লিনিক থেকে কি কি স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হয় তার তালিকা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে টাঙ্গানো আছে। কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিকের সেবা প্রদানকারীদের মতে- স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ পাওয়া যায় না রোগীদের এ অভিযোগ সত্য নয়। সেবা প্রদানকারীরা সেবার মানন্নোয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি আছে এবং তা কার্যকর। কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিকের তহবিলসহ ঔষধ সরবরাহ সম্পর্কে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি অবগত নয়। পূর্ণাঙ্গভাবে কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করলে বাংলাদেশের গ্রামীন জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের দোর গোড়ার পৌছে দিতে পারে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এবং স্থানীয় সরকারের কার্যকর নেতৃত্বে এই ক্লিনিকগুলো বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারে।

উপজেলা অনুযায়ী কমিউনিটি ক্লিনিক এর সংখ্যা ও জনবল এবং উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা

উপজেলার নাম	কমিউনিটি ক্লিনিক	জনবল (পুরুষ)	জনবল (নারী)	উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র
গাইবান্ধা সদর	৪৯	২৫	২৭	০৭
গোবিন্দগঞ্জ	৬২	৩০	৩২	১০
সাদুল্যাপুর	৩৫	১৬	২০	০৬
সুন্দরগঞ্জ	৫৫	৩০	২৬	০৭
ফুলছড়ি	১৭	০৭	০৮	০১
সাঘাটা	৩৩	১৫	২৩	-
পলাশবাড়ী	৩২	২০	১২	০৫
সর্বমোট	**২৮৩**	**১৪৩**	**১৪৮**	**৩৬**

২২.১২.২০১৫ইং তারিখে 'দৈনিক আজকের জনগণ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাঘাটায় ৩৪ কমিউনিটি ক্লিনিকে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, চিকিৎসা সেবা ব্যহত' শীর্ষক সংবাদ শিরোনামে ঘটনাটি ছিল এমন–

সাঘাটার ৩৪টি কমিউনিটি ক্লিনিকে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। ফলে ক্লিনিকগুলোতে সরকারিভাবে বরাদ্দ দেয়া ল্যাপটপ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি কাজে লাগাতে পারছে না। এতে করে অফিসের যাবতীয় কাজকর্মে মারাত্মক ব্যহত হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগের এক শ্রেণির অসাধু কর্মকর্তার আন্তরিকতার অভাব ও দাপ্তরিক জটিলতার অজুহাত দেখিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনসিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ নামক প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর হাতের নাগালে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে সাঘাটা উপজেলার ১০ ইউনিয়নে ৩৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়। এই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর কার্যক্রম বেগবান করতে সরকারি জনবল নিয়ে ঔষধ সরবরাহ ও লজিষ্টিক সাপোর্ট প্রদান করেছে। কিন্তু সাঘাটা উপজেলার ৩৪টি কমিউনিটি ক্লিনিকে এখনো বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হচ্ছে। আর গরমের দিনে দুর্ভোগে পড়তে হয় চিকিৎসক ও রোগীদের। সাঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিদর্শক তাজুল ইসলাম জানান বহু তদবিরে পদুমশহর ইউনিয়নে ২টি কমিউনিটি ক্লিনিকে বিদ্যুৎ সংযোগ নেয়া সম্ভব হয়েছে। বাকিগুলোতে এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করছেনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি। অপরদিকে, কচুয়া ইউনিয়নের অনন্তপুর কমিউনিটি ক্লিনিকের হেলথ প্রোভাইডার শফিউর রহমান জানান, প্রায় ২ বছর আগে এ ক্লিনিকে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য সার্ভিস তার ও ওয়ারিং কাজ সম্পন্ন হলেও অদ্যাবধি মিটার বসিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়নি। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কতিপয় কর্মচারী মোটা অংকের টাকা দাবি করায় এবং তা না দেয়ার কারণেই বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ করেন।

গাইবান্ধায় ১০০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক সদর হাসপাতালের জনবল কাঠামো

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
তত্ত্বাবধায়ক	০১	০১	-
সিনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী)	০১	০১	-
সিনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী)	০১	-	০১
সিনিয়র কনসালটেন্ট (ইএনটি)	০১	-	০১
সিনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু)	০১	-	০১
সিনিয়র কনসালটেন্ট (অর্থোসাজারী)	০১	-	০১
সিনি: কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া)	০১	-	০১
সিনিয়র কনসালটেন্ট (চক্ষু)	০১	-	০১
সিনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন)	০১	-	০১
সিনিয়র কনসালটেন্ট (চর্ম ও যৌন)	০১	-	০১
সিনিয়র কনসালটেন্ট (কার্ডিওলজি)	০১	-	০১
জুনিয়ার কনসালটেন্ট (শিশু)	০১	০১	-
জুনিয়ার কনসালটেন্ট (কার্ডিওলজি)	০১	০১	-
জুনিয়ার কনসালটেন্ট (চক্ষু)	০১	-	০১
জুনিয়ার কনসালটেন্ট (চর্ম ও যৌন)	০১	-	০১
জুনি: কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া)	০১	০১	-
জুনিয়ার কনসালটেন্ট(মেডিসিন)	০১	০১	-
জুনিয়ার কনসালটেন্ট(অর্থোপেডিক)	০১	০১	-
জুনিয়ার কনসালটেন্ট(প্যাথলজি)	০১	-	০১
জুনিয়ার কনসালটেন্ট(সার্জারী)	০১	০১	-
জুনিয়ার কনসালটেন্ট(রেডিওলজি ও	০১	-	০১

ইমেজিং)			
জুনিয়ার কনসালটেন্ট(গাইনী এন্ড অবস)	০১	-	০১
আবাসিক মেডিকেল অফিসার	০১	০১	-
মেডিকেল অফিসার	০৪	০৪	-
ইমারজেন্সী মেডিকেল অফিসার	০৩	-	০৩
রেডিওলজিস্ট	০১	-	০১
প্যাথলজিষ্ট	০১	-	০১
ডেন্টাল সার্জন	০১	০১	-
সহকারি সার্জন/ সম্মান	০৮	-	০৮
আর্য্যুবেদীক মেডিকেল অফিসার	০১	০১	-
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	-	০১
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০১	-	০১
নার্সিং সুপারভাইজার	০২	০২	-
সিনিয়র স্টাফ নার্স	২৬	২৩	০৩
স্টাফ নার্স	০৯	০৯	-
সহকারি নার্স	০৫	০৩	০২
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট(ল্যাবঃ)	০২	০২	-
মেডিঃ টেকনোলজিস্ট(রেডিওগ্রাফী)	০২	০২	-
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট(ডেন্টাল)	০১	০১	-
মেডিঃটেকনোলজিস্ট(ফিলিওথেরাপী)	০১	০১	-
ফার্মাসিস্ট	০৩	০৩	-
প্রধান সহকারি	০১	০১	-
উচ্চমান সহকারি	০১	০১	-
প্রধান সহকারি কাম হিসাব রক্ষক	০১	০১	-
ক্যাশিয়ার	০১	-	০১
স্টেনোটাইপিস্ট	০১	-	০১
অফিস সহকারি কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১	-
কম্পিউটার অপারেটর	০১	-	০১
রিসিপসনিস্ট	০১	-	০১
কার্ডিওগ্রাফার	০১	-	০১
ইনস্টুমেন্ট কেয়ার	০১	-	০১
লিলেন কিপার	০১	-	০১
টিকিট ক্লার্ক	০১	-	০১
ওয়ার্ড মাস্টার	০১	-	০১
স্টোর কিপার	০১	০১	-
স্বাস্থ্য শিক্ষাবিদ	০২	০২	-
ড্রাইভার	০২	০২	-
পার্সোনাল কম্পাউন্ডার (আর্য্যুবেদীক)	০১	০১	-
স্টেরিলাইজার কাম মেকানিক	০১	-	০১
পাম্প/ জেনারেটর অপারেটর	০১	-	০১
ল্যাবরেটরী এটেনডেন্ট	০১	-	০১
স্ট্রেচার বেয়ারার	০১	-	০১
ডার্ক রুম সহকারি	০১	-	০১

ও টি বয়	০১	-	০১
অফিস সহকারি	১০	০৯	০১
মশালচী	০২	০২	-
কুক	০১	-	০১
গার্ডেনার	০১	০১	-
সুইপার	০৪	০৪	-
ডোম	০১	০১	-
মোট	১৩৯ জন	৮৫ জন	৫২ জন

গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে জরুরি ও বহিঃ বিভাগ এবং বিভিন্ন সেবাসমূহ

জানুয়ারি/১৫ইং হইতে অক্টোবর/১৫ইং পর্যন্ত তথ্য

মাসের নাম	জরুরি বিভাগ	বহি বিভাগ	এক্সরে বিভাগ	আল্ট্রাসনোগ্রাম	ইসিজি	প্যাথলিজ	রক্ত সঞ্চালন	আইএমসিআই
জানুয়ারি	৩৪৭৫	৯০১৭	১৪৭	২৮৯	১০২	৫২১	১৭২	৭৭২
ফেব্রুয়ারি	৩৪৭৫	১০৩৭৮	১০	২১৫	১১৩	৫৮৩	১৫০	১১৭৪
মার্চ	৩৯৩৮	১২৫৬০	-	২৩১	১১০	৬৫৬	১৮২	১০৩৫
এপ্রিল	৪২৩৬	১২১৩০	৮৮	২৩১	১১১	৫৯৬	২২৫	৭৭০
মে	৪৩৬৭	১০৩৮৩	১২৩	২৯১	১১৩	৭০৬	১৬১	৭১৯
জুন	৪৩৪৯	১১১৮৩	১২৫	৪০০	৯০	৫৯৩	২০৮	১০৪৬
জুলাই	৪৩৪৭	১০৬২৬	১৩১	৩৩৩	১০৫	৫৯১	১৫৯	৮১৫
আগস্ট	৩৯৮৮	১২৫১১	১০১	২৪০	১১৩	৭৪১	২৪৮	৫২৮
সেপ্টেম্বর	৪৭৩৬	৯৯৪৮	৯৮	-	৯৬	৫৩৬	১৩৬	৫৪৯
অক্টোবর	২০৫৩	১২৭১০	৮৬	৩৫৫	১২৩	৬৫৫	২২৭	৮৯৫
সর্বমোট=	৩৮৯৬৪	১১১৪৪৬	৯০৯	২৫৮৬	১০৭৬	৬১৭৮	১৮৬৮	৮২৫৩

গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে স্বাভাবিক ডেলিভারী, সিজারিয়ান ডেলিভারী ও অপারেশন স্বাস্থ্য সেবাসমূহ

জানুয়ারি/১৫ইং হইতে অক্টোবর/১৫ইং পর্যন্ত তথ্য

মাসের নাম	স্বাভাবিক ডেলিভারী	সিজাররিয়ান ডেলিভারী	এএনসি	পিএনসি	দন্ত বিভাগ	ডগবাইক	অন্যান্য অপারেশন	অর্থোসাজারী
জানুয়ারি	৭৮	১১	২৭৭	১১১	৮১৬	৫৪১	৩৫	৪৯১
ফেব্রুয়ারি	৫৪	০৭	২৯৩	৮০	৭৯৬	৩১৪	২৭	৪৮১
মার্চ	৭০	১৯	৩৬৯	১১৫	৮৩৮	৪১২	২৮	৪৮৩
এপ্রিল	৬২	২৪	৩৪৯	৯৯	৮২৯	২০২	৩৮	৪৮৫
মে	৭৪	২১	৩০৩	১১৭	৮০০	-	৫৭	৫২৯
জুন	৭৭	১৯	৩২৩	১১৫	৮৩২	-	৭০	৫৮৭
জুলাই	৮৩	০১	৩১৩	৯৫	৭১৮	১২০	৬৯	৪২৪
আগস্ট	৫৯	-	৩২০	৭২	৬৩১	১৪০	৯২	৭০১
সেপ্টেম্বর	৫৪	-	২৭৬	৭৮	৬৮০	৩২০	৯৮	৪৭৭
অক্টোবর	৭৩	-	৩২৮	৭৩	৭১০	২৮০	৯৭	৭০৬
সর্বমোট=	৬৮৪	১০২	৩১৫১	৯৫৫	৭৬৫০	২৩২৯	৬১১	৫৪৬৪

গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে মাসভিত্তিক ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীর সংখ্যার তথ্য

মাসের নাম	পুরুষ ওয়ার্ড	মহিলা ওয়ার্ড	গাইনী ওয়ার্ড	ডায়রিয়া ওয়ার্ড	মোট
জানুয়ারি	৫০৭	৫৭১	২৯২	৪৯৭	১৮৬৭
ফেব্রুয়ারি	৪৬৮	৬৩৩	২২৫	৩১৬	১৬৪২
মার্চ	৪৯৪	৭৫৮	২৯৭	১৭৯	১৭২৮
এপ্রিল	৫২৮	৭৮০	৩০৮	১৯৮	১৮১৪
মে	৮৫৭	৩১৪	৫৪৬	১৬৭	১৮৮৪
জুন	৫১৩	৯০৪	২৮৩	২২৬	১৯২৬
জুলাই	৫৭৭	৮২০	২১১	২২২	১৮৩০
আগস্ট	৫১৭	৮২৩	২১৬	২২৫	১৭৮১
সেপ্টেম্বর	৪৯৪	৭৫৪	২১০	১০৩২	২৪৯০
অক্টোবর	৬১২	৮২৬	২৪৪	৩৭৫	২০৫৭
নভেম্বর	৪৪৮	৭৬১	১৮১	৩৩৬	১৭২৬
সর্বমোট=	৬০১৫	৭৯৪৪	৩০৩১	৩৭৭৩	২০৭৪৫

গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে বেড অকুপেন্সী রেট

আন্তঃ বিভাগ ওয়ার্ডভিত্তিক ভর্তিকৃত ও অবস্থানকৃত রোগীর মাস ওয়ারী হিসাব

মাসের নাম	পুরুষ ওয়ার্ড	মহিলা ওয়ার্ড	গাইনী ওয়ার্ড	ডায়রিয়া ওয়ার্ড	মোট	বেড অকুপেন্সী রেট
জানুয়ারি	১৭৯৪	১৫৭১	৫২৭	৯৩৫	৪৮২৭	১৫৫%
ফেব্রুয়ারি	১৩৯৬	১৭২২	৩৫৭	৫৭৯	৪০৫৪	১৪৪%
মার্চ	১৪৮৫	১৭৭০	৫২১	৩০৭	৪০৮৩	১৩১%
এপ্রিল	১৫২১	১৮৩৫	৭৬২	৩২২	৪৪৪০	১৪৮%
মে	১৪৮৬	১৮০১	৭৯	২৪৮	৪২৪৪	১৩৭%
জুন	১৩৬২	১৯৩৪	৫৬৫	৩১৩	৪১৭৪	১৩৯%
জুলাই	১৫৭৪	১৭৩০	৪৪৪	৩২৭	৪০৭৫	১৩১%
আগস্ট	১৬১৩	১৯৫০	৩০৯	২৮৯	৪১৬১	১৩৪%
সেপ্টেম্বর	১৪২৭	১৬০৬	৪২০	১৪৬৮	৪৯২১	১৬৪%
অক্টোবর	১৬৪৪	১৯৬১	৩২৭	৪৯৬	৪৪২৮	১৪২%
নভেম্বর	১৪৭০	১৮৯০	৩৮৮	৫০৪	৪২৫২	১৪২%
সর্বমোট=	১৬৭৭২	১৯৭৭০	৫৩২৯	৫৭৮৮	৪৭৬৫৯	-

গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার সিজার-এর সেবাগ্রহণকারী রোগীর সংখ্যা (জানুয়ারি-অক্টোবর-২০১৫)

মাসের নাম	সার্জারি		সিজার		অর্থোপেডিক		গাইনি		ইএনসি	
	বড়	ছোট	বড়	ছোট	বড়	ছোট	বড়	ছোট	বড়	ছোট
জানুয়ারি	০৩	০৬	১১	-	০১	১৭	০৩	০৪	০১	-
ফেব্রুয়ারি	০২	০৩	০৭	-	০৪	১৪	০৩	০১	-	-
মার্চ	-	০২	১৯	-	০৪	১৭	০৩	-	০২	-
এপ্রিল	০২	০৪	২৪	-	০১	১৩	১৭	-	০১	-
মে	০৯	২৩	২১	-	০৩	১০	০২	০৩	০৭	-
জুন	১১	২৮	১৯	-	০২	২১	০১	০৩	০৪	-
জুলাই	০৩	৪৯	০১	-	-	১১	-	০৩	০২	-
আগস্ট	১১	৪১	-	-	২৯	০২	-	০১	০৮	-
সেপ্টেম্বর	০৮	৬১	-	-	০২	২০	০১	-	০৫	-
অক্টোবর	১৩	৫২	-	-	০১	১৭	-	-	১৪	-
মোট=	৬২	২৬৯	১০২	-	৪৭	১৪২	৩০	১৫	৪৪	-

সদর আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা ভেঙে পড়েছে

গত ২৯ জুন, ২০১৫ তারিখে 'সাপ্তাহিক চলমান জবাব' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সদর আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা ভেঙে পড়েছে' শীর্ষক সংবাদ শিরোনামের ঘটনাটি ছিল এমন–

অনিয়ম, দুর্নীতিতে ও নানা সমস্যায় নিমজ্জিত হয়ে আছে ঘোষণা দেওয়া দুইশ' শয্যা বিশিষ্ট গাইবান্ধা সদর আধুনিক হাসপাতাল। হাসপাতালের টয়লেট হতে শুরু করে চারদিকে ময়লা আবর্জনায় মনে হয় হাসপাতালটি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কারণে এবং তাদের যোগসাজশে খাদ্য দ্রব্য হতে শুরু করে প্রয়োজনীয় সব কিছু দায়সারাভাবে সরবরাহ করছে ঠিকাদার। হাসপাতালের খাবার সরবরাহকারী ঠিকাদার রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ বনে গেছেন। গাইবান্ধা সদর আধুনিক হাসপাতালটি অনেক গুরুত্ব বহন করে। দুইশ শয্যার ঘোষণা দেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত এর অবকাঠামো নির্মাণ এবং লোকবল নিয়োগ করা হয়নি। কেউ কেউ বলছেন এর পেছনে 'মোড়ল' কিছু স্থানীয় ডাক্তারের হাত রয়েছে। কারণ জেলার সবচেয়ে বড় এ হাসপাতালটি যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে ওই 'মোড়ল' ডাক্তারদের প্রাইভেট চিকিৎসা বাণিজ্যে সমস্যার সৃষ্টি হবে। নানা সীমাবদ্ধতার পরও এ হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। অনেক অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ দেয়া হলেও তারা স্থানীয় ডাক্তারদের রাজনীতির শিকার হয়ে এখান থেকে বদলি নিতে বাধ্য হন। দিনে-রাতে বিভিন্ন সময় এ হাসপাতালে চিকিৎসা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, হাসপাতালের অধিকাংশ চিকিৎসক তাদের আন্তরিকতার প্রতি উদাসীন। পুরো হাসপাতালের টয়লেটগুলো অকেজো ও সম্পূর্ণ ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে গেছে। ময়লা আবর্জনার দুর্গন্ধে ভর্তিকৃত রোগী ও চিকিৎসা নিতে আসা লোকজন নিজেরাই অসুস্থ হয়ে পড়ার উপক্রম হন। হাসপাতালে রয়েছে দালালদের উপদ্রব। এ হাসপাতালে চিকিৎসার সব ব্যবস্থা থাকলেও দালালরা রোগীদের ফুসলিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ দীর্ঘ দিনের। রয়েছে বেসরকারি এ্যাম্বুলেন্সের জমজমাট ব্যবসা। হাসপাতালের কিছু

কর্মচারির সঙ্গে বেসরকারি এ্যাম্বুলেন্স চালকদের রয়েছে যোগসাজশ। যে কারণে হাসপাতাল চত্তরে বেসরকারি এ্যাম্বুলেন্সের সিরিয়াল সব সময় লেগে থাকে। অথচ হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্স বসে থাকে অধিকাংশ সময়। কিছু ডাক্তার এবং নার্সের অনিয়ম, দুর্নীতি ও দায়িত্ব অবহেলার কারণে এ হাসপাতালের স্বাভাবিক কার্যক্রম অনেকটা ভেঙে পড়েছে। অতি সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের অবহেলায় একজন দরিদ্র প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে। সবচেয়ে বেশি অনিয়ম আর দুর্নীতি হচ্ছে হাসপাতালের ঠিকাদারি বিভাগে। নিম্নমানের এবং একই রকমের খাবার হরহামেশা সরবরাহ এখন এ হাসপাতালের নিয়মে পরিণত হয়েছে। এসব অনিয়ম ও দুর্নীতি অবলীলায় চলতে থাকলেও হাসপাতাল প্রশাসন কিছুই করতে পারছে না। জানা গেছে, হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক (সিভিল সার্জন) এসব বিষয়ে কিছু বলতে গেলেই তার ওপর নানামুখী চাপ ও হুমকি আসে। কিছু স্থানীয় ডাক্তার (সরকারি ও বেসরকারি) সদর হাসপাতালের এসব অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন। হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণে অন্য ডাক্তারের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি

গত ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে 'দৈনিক মাধুকর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সদর আধুনিক হাসপাতালে রোগীদের পথ্য সরবরাহকারি নিয়োগে অনিয়ম' শীর্ষক সংবাদ শিরোনামের ঘটনাটি ছিল এমন–

গাইবান্ধা সদর হাসপাতালের রোগীদের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের পথ্য সরবরাহের ঠিকাদার নিয়োগে সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে পথ্য সংক্রান্ত দরপত্রে বিভিন্ন শর্ত লংঘন করে বাজার দরের অজুহাতে সর্বোচ্চ অবৈধ দরদাতাকে গ্রহণ করার পায়তারা চালানো হচ্ছে। যা বাস্তবায়িত হলে প্রতিবছর রোগীরা ১২ লাখ ৬৫ হাজার টাকার পথ্য থেকে বঞ্চিত হবে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী বরাবরে একটি লিখিত অভিযোগে এই বেআইনি দরপত্র প্রদান কার্যক্রমে প্রতিকার ও উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করে সর্বনিম্ন দরদাতাকে পথ্য সরবরাহকারি নিয়োগের দাবি জানানো হয়। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের পথ্য দরপত্রের শর্তাবলীর ক্রমিক নং ৩৬-এ উল্লেখ আছে যে, প্রাক্কলিত বাজারের দরের চেয়ে উর্ধ্ব দর কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং পি.পি আর ২০০৬ এর ধারা ৩১ নং মোতাবেক, পণ্য কার্য ইত্যাদি ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করে সর্বনিম্ন এবং নির্ভরযোগ্য দরদাতার সাথেই হাসপাতালের পথ্য সরবরাহ চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। অভিযোগে আরো উল্লেখ করা হয়, সর্বোচ্চ দরদাতা মেসার্স স্বর্ণা এন্টারপ্রাইজের প্রদত্ত দরের সাথে জেলা মার্কেটিং অফিসারের দাখিলকৃত বাজার দরের কোন মিল নেই। বরং তাতে উল্লেখিত সকল পণ্যের মূল্য বাজারের চাইতে বেশি। অথচ উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকেই পথ্য সরবরাহের ঠিকাদার নিয়োগের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে সিভিল সার্জন ডা. নির্মলেন্দু চৌধুরীর সাথে যোগাযোগের চেষ্টায় একাধিকবার ফোন করলেও তিনি রিসিভ করেননি।

ডাক্তারি অবহেলায় মৃত্যু

গত ১৮ মার্চ ২০১৫ তারিখে 'দৈনিক মাধুকর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাদুল্যাপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ' শীর্ষক সংবাদ শিরোনামের ঘটনাটি ছিল এমন–

সাদুল্যাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দায়িত্বরত ডাক্তার, পরিদর্শিকা ও আয়ার অদক্ষতা ও অবহেলার কারণে পিয়ারা বেগম (২৬) নামে এক প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। সাদুল্যাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মঙ্গলবার বিকাল ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পিয়ারা বেগমের ননদ সাধনা বেগম জানান, নিজ বাড়িতে পেয়ারার প্রসব বেদনা উঠলে সকাল ১১টার দিকে তাকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দায়িত্বরত ডাক্তার, পরিদর্শিকা ও আয়া রোগীর অবস্থা আশংকাজনক বলে তাকে ভর্তি করাতে বলেন। পরে বিকেল ৩টার দিকে পিয়ারাকে ডেলিভারী রুমে নিয়ে গেলে একটি মেয়ে সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু ডেলিভারীর পর ব্লিডিং বন্ধ না হওয়ায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন পিয়ারা বেগম। এদিকে ঘটনার পর থেকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হরিপদ চন্দ্র ঘোষ, এমওএসিএইচ ডা. সেকেন্দার দায়িত্বরত পরিদর্শিকা ও আয়াসহ অন্যান্যরা গা ঢাকা দিয়েছেন। নিহত পিয়ারা বেগমের স্বামী কাশেম মিয়ার অভিযোগ দায়িত্বরতদের অদক্ষতা ও অবহেলার কারণে পিয়ারার মৃত্যু হয়েছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হরিপদ চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে মুঠোফোনে কথা হলে তিনি জানান, ডেলিভারীর বিষয়টি ডাঃ সেকেন্দার দেখেন। এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত জানাতে পারবেন। তবে ডা. সেকেন্দারের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, এ বিষয়টি তার জানা নেই। সাদুল্যাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আখতার আলম ভনের সঙ্গে কথা হলে তিনি বিষয়টি দেখবেন বলে জানান।

সীমাবদ্ধতা ও সুপারিশ

- আধুনিক সদর হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্স সবসময় সচল রাখা। আধুনিক জেনারেটর স্থাপন করা।
- হাসপাতালের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ প্রয়োজন।
- স্থানীয় চাহিদা মোতাবেক ১২০০-১৫০০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ করা দরকার। পাশাপাশি নির্মানাধীন ভবনের কাজ শেষ করার ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।
- সদর হাসপাতালে গড়ে প্রতিদিন বিভিন্ন বিভাগ/ওয়ার্ডে রোগী থাকে ২৫০-৩৫০ জন যার মধ্যে আন্তবিভাগে গড়ে ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যাই প্রায় ১০০-১৫০ জন। অনতিবিলম্বে ৩০০ শয্যার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শেষ করার জন্য সরকারি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের উদ্যেগী ভূমিকা পালন করা। জনসংখ্যা ও রোগীর আধিক্য বিবেচনায় ২০১২ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ৫০০ শয্যায় উন্নীত করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- সদর হাসপাতালে উপযোগী দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। অবিলম্বে শুন্য পদে নিয়োগ দান করে জনবল দ্বিগুণ করার উদ্যোগ নেয়া।
- জেলার বিভিন্ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। সদর হাসপাতাল ও থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপর রোগীর চাপ কমাতে জেলার সকল ইউনিয়নে ১টি করে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকান্ড/ভূমিকা শক্তিশালী করতে স্থানীয় উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।
- হাসপাতালের ড্রেনেজ সিষ্টেমটি আরো সচল রাখা যাতে হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়।
- হাসপাতালে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা খুবই দুর্বল।
- হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত সভা আয়োজন করা এবং উক্ত কমিটি কর্তৃক হাসপাতালর সার্বিক অব্যবস্থাপনা/সীমাবদ্ধতার চিত্র ও গৃহীত পদক্ষেপ জনসমক্ষে তুলে ধরার ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের সময়-অসময় যাওয়া আসা ও প্রতি রোগীর পিছনে গড়ে প্রায় ৩ জন অভিভাবকসহ প্রতিদিন বিভিন্ন পর্যায়ে ৩,০০০ থেকে, ৫০০০ জনগণের পদচারণায় মুখরিত থাকে সদর হাসপাতাল। তাই একজন বয়োবৃদ্ধ, শিশু, নারীদের জন-মানুষের ভীড় সামলে বিড়ম্বনার শিকার হয় গন্তব্যে পৌছাতে হয়। প্রধান ফটক তথা কোথাও নিরাপত্তা রক্ষী, ওয়ার্ড বয় ও আয়া না থাকায় হাসপাতালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়ার সম্ভাবনা থাকে। জেলা হাসপাতালের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- হাসপাতালে পর্যাপ্ত কক্ষ না থাকায় ডাক্তারদেরকে গাদাগাদি করে চিকিৎসা সেবার কাজ করতে হয়। গ্রামের একজন সাধারণ রোগীর পক্ষে বিভিন্ন বিভাগের ডাক্তারদের খুঁজে বের করে চিকিৎসা গ্রহণ করার কাজটি প্রায়শ: দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই বিষয়টির জন্য জেলা হাসপাতালে একটি তথ্যকেন্দ্র চালু করা প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে কোন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।
- ইমারজেন্সি এবং মেডিকেল অফিসারের পদসংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- পরীক্ষা নিরীক্ষার যন্ত্রপাতিসমূহের মধ্যে বিশেষ করে ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন সরবরাহ, ৩টি/৪টি আলট্রাসনোগ্রাম মেশিন জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে সরবরাহ করা।
- গরীব ও দুস্থ রোগীদের প্রতি ডাক্তার এবং নার্সদের আরো আন্তরিক হতে হবে।
- হাসপাতালে টিকেট কাটার বুথের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- পরীক্ষাগারগুলো সবসময় খোলা রাখা দরকার যাতে কম খরচে সবাই সুযোগ সুবিধা পেতে পারে।
- বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ফলোআপ দরকার এবং উপকরণের সংখ্যা বাড়ানো উচিত।
- গর্ভবতী মা ও শিশুর ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থা এখানে জোরদার করা উচিত।
- ইউনিয়নে অবস্থিত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে মেডিকেল অফিসারের পদ সৃষ্টি, বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা এবং নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ দেওয়া।

সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার

সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে পূর্ণ নিরাপত্তাসহ জীবনযাপনের নিশ্চয়তা পাওয়া মানুষের অধিকার। মানুষ তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের কাছে এ অধিকার রাখে। এই অধিকার আদায়ের জন্য রাষ্ট্র নিজে চেষ্টা করবে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কামনা করতে পারে। কারণ সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আমাদের মানবাধিকার, যা আমরা জন্মের সাথে সাথে নিয়ে এসেছি। আমরা কেউ এ অধিকারকে হস্তান্তর করতে পারি না। যে অধিকার আমার বেঁচে থাকার অধিকারের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সে অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব একদিকে আমাদের এবং মূলত রাষ্ট্রের।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫(ঘ) নং অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে-
"সামাজিক নিরাপত্তা অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব ব্যাধি পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত কারণে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার"।

এছাড়াও সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা একটি নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত বাস্তবায়িত করার কথা উল্লেখ আছে।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-"সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে"। এছাড়াও মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২৫নং অনুচ্ছেদে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সমাজ সেবা কর্মসূচির সুযোগ এবং অন্যান্য অক্ষমতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা লাভের কথা বলা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা জাল

মানুষের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্র বা অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক নেয়া পদক্ষেপকে 'সামাজিক নিরাপত্তা জাল' বলে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ, যেখানে বেশির ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। কোন কোন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের সর্বস্ব নিয়ে যায়, তাকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অসহায় করে তোলে। এ ধরনের অসহায় মানুষগুলোর জন্য রাষ্ট্র তার দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে, যাতে করে অসহায় মানুষগুলোর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত না হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও দারিদ্র্য এবং বিভিন্ন অক্ষমতার কারণেও আমাদের দেশের অনেক মানুষ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদক্ষেপ এই মানুষগুলোর জীবনকে যেমন স্বাভাবিক অবস্থানে আসতে সাহায্য করে, অন্যদিকে আমাদের দেশের অবস্থাও উন্নত হতে থাকে।

আমাদের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তাকে আমরা 'সোশ্যাল সেফটি নেট' বা সামাজিক নিরাপত্তা জাল নামে চিনি। এই নিরাপত্তা জালের মধ্যে রয়েছে কিছু তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা, আবার কিছু ব্যবস্থা যা ধীরে ধীরে আমাদের দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়।

সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে খাতগুলো চিহ্নিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হলো- ১. খাদ্য নিরাপত্তা, ২. কর্মসংস্থান, ৩. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ নারীদের ভাতা প্রদান, ৪. বয়স্ক ভাতা প্রদান, ৫. অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা প্রদান, ৬.মাতৃস্বাস্থ্য কল্যাণ ইত্যাদি।

উল্লেখিত নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বাস্তবায়িত হয়। এসব কর্মসূচি নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হলেও রাষ্ট্র নিজে বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরকে দায়িত্ব প্রদান করে থাকে। কখনো কখনো রাষ্ট্রের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন বা সংস্থাও সামাজিক নিরাপত্তা জাল নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করে।

জালের আওতায় কারা পড়বে

ক. হতদরিদ্র: দেশের অবস্থা ভাল থাকলেও যারা দরিদ্র ও অসহায়, যাদের অর্থ উপার্জনের সুযোগ খুবই স্বল্প দুযোর্গ মোকাবিলার কোনো সামর্থ্য নেই।

খ. মৌসুমী-দরিদ্র : দেশের এই অংশটি দারিদ্র্য সীমার কাছাকাছি থাকে এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে চরম দারিদ্র্যের শিকার হয়।

গ. বিশেষ অবস্থার শিকার : শুধু দরিদ্র হওয়ার কারণে নয়, তাদের অসহায়ত্বকে ঘিরে রয়েছে তাদের শারীরিক অক্ষমতা, ধর্ম, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য রোগ দ্বারা আক্রান্ত,পারিবারিক নির্যাতনের শিকার।

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের কি সেবা কিভাবে পাবেন

১. ঋণ কার্যক্রম: আত্মকর্মসংস্থানের জন্য দুঃস্থ অসহায়/বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও স্বেচ্ছাধীন মহিলা সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে।

২. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:জুলাই-জুন পর্যন্ত ১ বৎসর মেয়াদী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (প্রতি বৎসর)।

৩. ভিজিডি কার্যক্রম: কার্ড সরবরাহ/মনিটরিং করা/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ।

৪. ভাতা কর্মসূচি: মার্তৃত্ব ভাতা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল।

৫. নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত কমিটি অভিযোগ গ্রহণ/শুনানী/পারিবারিকভাবে নিষ্পত্তি/আইনী সহায়তা।

৬. স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠনকে রেজিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের কি সেবা কিভাবে পাবেন

বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তির নমুনা ছবি	বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তির শর্তাবলী	ভাতা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া
	▪ প্রার্থীর বয়স ৬৫ বৎসর হতে হবে। ▪ প্রার্থীর গড় আয় বার্ষিক অর্ন্ধধ ৩০০০/- টাকা। ▪ শারীরিকভাবে অক্ষম, অসুস্থ, কর্মহীন ব্যক্তিগণ অগ্রাধিকার পাবেন। ▪ মুক্তিযোদ্ধা, নিস্ব, উদ্বাস্তু ও ভূমিহীনগণ ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার পাবেন। ▪ সরকারি কর্মচারী বা তার পরিবারের সদস্য ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য হবেন না। ▪ ভিজিডি বা অন্যকোন সরকারি অনুদান পেলে ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য হবেন না। ▪ দিনমজুর, ঝি এর কাজ কিংবা ভবঘুরে হলে ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য হবেন না।	▪ উপজেলা সমাজসেবা অফিসার কর্তৃক স্থানীয় জনগণকে অবহিত করা হবে। ▪ নির্ধারিত ছকে আবেদনকারীকে আবেদন করতে হবে। ▪ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক প্রাথমিক বাছাই করে উপজেলা কমিটিতে তা প্রেরণ করবেন। ▪ উপজেলা কমিটি চূড়ান্ত যাচাই বাছাই করে ভাতাভোগী নির্বাচন করবেন। ▪ ব্যাংকে হিসাব খোলার মাধ্যমে নির্বাচিত ভাতাভোগীদের ভাতা পরিশোধ করা হবে।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তির নমুনা ছবি	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তির শর্তাবলী	ভাতা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া
	▪ বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। ▪ মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকার উর্ধ্বে নয় এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ। ▪ ভাতা প্রাপককে অবশ্যই দুস্থ প্রতিবন্ধী হতে হবে।	▪ উপজেলা সমাজসেবা অফিসার কর্তৃক স্থানীয় জনগণকে অবহিত করা হবে। ▪ নির্ধারিত ছকে

	▪ সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। ▪ ৩০ বা তদূর্ধ বয়সী হতে হবে। ▪ বাছাই কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে। ▪ প্রতিবন্ধী গরীব ছাত্রদের জন্য বয়সসীমা শিথিলযোগ্য (৬ বছর এবং তদূর্ধ বয়স)। ▪ গরীব মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসার লক্ষ্যে শিথিলযোগ্য। ▪ সরকারি কর্মচারী বা তার পরিবারের সদস্য ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য হবেন না। ▪ ভিজিডি বা অন্যকোন সরকারি অনুদান পেলে ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য হবেন না। ▪ দিনমজুর, ঝি এর কাজ কিংবা ভবঘুরে হলে ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য হবেন না।	আবেদনকারীকে আবেদন করতে হবে। ▪ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক প্রাথমিক বাছাই করে উপজেলা কমিটিতে তা প্রেরণ করবেন। ▪ উপজেলা কমিটি চূড়ান্ত যাচাই বাছাই করে ভাতাভোগী নির্বাচন করবেন। ▪ ব্যাংকে হিসাব খোলার মাধ্যমে নির্বাচিত ভাতাভোগীদের ভাতা পরিশোধ করা হবে।

সমাজসেবা অধিদফতর থেকে প্রদেয় সেবাসমূহের বিবরণী:

কার্যক্রম	সেবা	সেবাগ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির সময়সীমা	সেবাদান কারী কর্তৃপক্ষ
পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম	▪ পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগণকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়ন; ▪ সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান; ▪ ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান; ▪ লক্ষ্যভুক্ত ব্যক্তিদের নিজস্ব পুঁজি গঠনের জন্য সঞ্চয় বৃদ্ধি।	▪ নির্বাচিত গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা, যিনি; ▪ আর্থসামাজিক জরিপের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতরে তালিকাভুক্ত পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের কর্মদলের সদস্য/সদস্য; ▪ সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ ও অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির জন্য 'ক' ও 'খ' শ্রেণিভুক্ত দরিদ্রতম ব্যক্তি অর্থাৎ যার মাথাপিছু বার্ষিক পারিবারিক আয় সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত; ▪ সুদমুক্ত ঋণ ব্যতীত অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির জন্য 'গ' শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ যার মাথাপিছু বার্ষিক পারিবারিক আয় ২৫ হাজার টাকার উর্ধ্বে;	▪ নির্ধারিত ফরমে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে আবেদনের পর; ▪ ১ম বার ঋণ (বিনিয়োগ) গ্রহণের জন্য আবেদনের পর ১ মাসের মধ্যে; ▪ ২য়/৩য় পর্যায়ের ঋণ (পুনঃবিনিয়োগ) গ্রহণ এর জন্য আবেদনের পর ২০ দিনের মধ্যে।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম	▪ পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র নারীদের সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়ন; ▪ পরিকল্পিত পরিবার তৈরিতে সহায়তা; ▪ জাতীয় জনসংখ্যা কার্যক্রম বাস্তবায়ন; ▪ সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন;	▪ নির্বাচিতগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা, যিনি; ▪ আর্থ সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতরে তালিকাভুক্ত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য এবং ▪ সুদমুক্ত ঋণ ও অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির জন্য 'ক' ও 'খ' শ্রেণিভুক্ত দরিদ্রতম ব্যক্তি নারী যার মাথাপিছু বার্ষিক পারিবারিক আয় সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত; ▪ সুদমুক্ত ঋণ ব্যতীত অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির জন্য 'গ' শ্রেণিভুক্ত নারী যার	▪ নির্ধারিত ফরমে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে আবেদনের পর; ▪ ১ম বার ঋণ(বিনিয়োগ) গ্রহণের জন্য আবেদনের পর ১ মাসের মধ্যে; ▪ ২য়/৩য় পর্যায়ের ঋণ (পুনঃবিনিয়োগ) গ্রহণ	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়

	▪ ৩ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান; ▪ লক্ষ্যভূক্ত নারীদের সংগঠিত করে সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজি গঠন।	মাথাপিছু বার্ষিক পারিবারিক আয় ২৫ হাজার টাকার উর্ধ্বে ;	এর জন্য আবেদনের পর ২০ দিনের মধ্যে ।	
এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	▪ ৫ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ;	▪ এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাদের বাৎসরিক আয় ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকার নিচে;	▪ ১ম বার ঋণ (বিনিয়োগ) গ্রহণের জন্য আবেদনের পর ১ মাসের মধ্যে; ▪ ২য়/৩য় পর্যায়ের ঋণ (পুনঃবিনিয়োগ) গ্রহণ এর জন্য আবেদনের পর ২০ দিনের মধ্যে।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও শহর সমাজসেবা কার্যালয় ।
শহর সমাজসেবা কার্যক্রম	▪ শহর এলাকায় দরিদ্র জনগণকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়ন; ▪ সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান; ▪ ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান; ▪ লক্ষ্যভূক্ত ব্যক্তিদের নিজস্ব পুঁজি গঠনের জন্য সঞ্চয় বৃদ্ধি।	▪ নির্বাচিত মহল্লার স্থায়ী বাসিন্দা, যিনি; ▪ আর্থ সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতরে তালিকাভূক্ত শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের কর্মদলের সদস্য/সদস্যা; ▪ সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ ও অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির জন্য 'ক' ও 'খ' শ্রেণিভূক্ত দরিদ্রতম ব্যক্তি যার মাথাপিছু বার্ষিক পারিবারিক আয় সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত; ▪ সুদমুক্ত ঋণ ব্যতীত অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির জন্য 'গ' শ্রেণিভূক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ যার মাথাপিছু বার্ষিক পারিবারিক আয় ১০ হাজার টাকার উর্ধে ;	▪ ১ম বার ঋণ(বিনিয়োগ) গ্রহণের জন্য আবেদনের পর ১ মাসের মধ্যে; ▪ ২য়/৩য় পর্যায়ের ঋণ (পুনঃবিনিয়োগ) গ্রহণ এর জন্য আবেদনের পর ২০ দিনের মধ্যে।	শহর সমাজসেবা কার্যালয়
অশ্রয়ণ/আবাসন কার্যক্রম	▪ আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসকারী দরিদ্র ব্যক্তিদের সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়ন; ▪ পরিকল্পিত পরিবার তৈরিতে সহায়তা প্রদান; ▪ সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান; ▪ ২ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান; ▪ সদস্যদের সঞ্চয়	▪ নির্বাচিত অশ্রয়ণ কেন্দ্রের বাসিন্দা; ▪ অশ্রয়ণ কেন্দ্রের সমিতির সদস্য।	▪ ১ম বার ঋণ (বিনিয়োগ) গ্রহণের জন্য আবেদনের পর ১ মাসের মধ্যে; ▪ ২য়/৩য় পর্যায়ের ঋণ (পুনঃবিনিয়োগ) গ্রহণ এর জন্য আবেদনের পর ২০ দিনের মধ্যে ।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়

	বৃদ্ধিকরণ।			
বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম	▪ সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত হারে বয়স্ক ভাতা প্রদান।	▪ দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও উপজেলার ৬৫ বছর বা তদূর্ধ বয়সী হতদরিদ্র মহিলা বা পুরুষ, যার বার্ষিক গড় আয় অনুর্ধ ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা; ▪ শারীরিক ভাবে অক্ষম ও কর্মক্ষমতাহীন প্রবীণ পুরুষ ও মহিলাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ▪ তালাকপ্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যক্ত, বিপত্নীক, নিঃসন্তান, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন প্রবীন পুরুষ ও নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়; ▪ যে সকল প্রবীণ ব্যক্তির আয়কৃত অর্থের সম্পূর্ণ অর্থ খাদ্য বাবদ ব্যয় হয় এবং স্বাস্থ্য চিকিৎসা, বাসস্থান ও অন্যান্য খাতে ব্যয় করার জন্য কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে না; ▪ ভূমিহীন বয়স্ক ব্যক্তি;	▪ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৩ মাসের মধ্যে নতুন ভাতাভোগী নির্বাচনসহ ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ; ▪ নির্বাচিত ভাতাভোগীকে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রতিমাসে প্রদান করা। তবে কেউ এককালীন উত্তোলন করতে চাইলে তিনি নির্ধারিত সময়ের শেষে উত্তোলন করবেন; ▪ ভাতগ্রহীতার নমিনী ভাতাভোগীর মৃত্যুর পূর্বে প্রাপ্ত বকেয়া টাকা এবং মৃত্যুর পর তিন মাস পর্যন্ত ভাতার টাকা উত্তোলন করা যাবে।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও শহর সমাজসেবা কার্যালয়।
অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম	▪ সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত হারে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান।	▪ ৬ বছরের উর্ধ্বে সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যিনি বয়স্কভাতা কিংবা সরকার কর্তৃক অন্য কোন ভাতা পান না; যিনি চাকুরিজীবী কিংবা পেনশনভোগী নন; ▪ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাদের বার্ষিক মাথাপিছু পারিবারিক আয় ২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার) টাকার কম;	▪ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৩ মাসের মধ্যে নতুন ভাতাভোগী নির্বাচনসহ ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ; ▪ নির্বাচিত ভাতাভোগীকে বরাদ্দপ্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রতিমাসে প্রদান করা। তবে কেহ এককালীন উত্তোলন করতে চাইলে তিনি নির্ধারিত সময়ের শেষে উত্তোলন করবেন;	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও শহর সমাজসেবা কার্যালয়।
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	▪ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ৪টি স্তরে বিভক্ত করে নিম্নরুপ হারে উপবৃত্তি প্রদান ঃ ▪ প্রাথমিক স্তর (১ম-৫ম শ্রেণি) জনপ্রতি মাসিক ৩০০ টাকা; ▪ মাধ্যমিক স্তর (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি) জনপ্রতি	▪ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী, যাদের বার্ষিক মাথাপিছু পারিবারিক আয় ৩৬,০০০ (ছত্রিশ হাজার) টাকার নিচে।	▪ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৩ মাসের মধ্যে নতুন উপবৃত্তিগ্রহণকারী নির্বাচনসহ উপবৃত্তি বিতরণ এবং নিয়মিতভাবে শিক্ষাকালীন সময়ে;	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও শহর সমাজসেবা কার্যালয়।

	মাসিক ৪৫০ টাকা; ▪ উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি) জনপ্রতি মাসিক ৬০০ টাকা; ▪ উচ্চতর স্তর (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) জনপ্রতি মাসিক ১০০০ টাকা;			
মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা	▪ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভাতা প্রদান। ▪	▪ মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী যার বার্ষিক আয় ১২,০০০ টাকার উর্ধ্বে নয়; ▪ মুক্তিযোদ্ধা বলতে জাতীয়ভাবে প্রকাশিত ৪টি তালিকার কমপক্ষে দুটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং বাংলাদেশ রাইফেলস হতে প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত আছে বা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক প্রকাশিত গেজেট বা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধা সনদপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা।	▪ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৬ মাসের মধ্যে নতুন ভাতাভোগী নির্বাচনসহ ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ; ▪ মুক্তিযোদ্ধা সম্মানীভাতা প্রতিমাসে প্রদান করা হয়, তবে কেউ ইচ্ছা করলে একাধিক মাসের বকেয়া ভাতা একত্রে উত্তোলন করতে পারবেন।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়।
সরকারি শিশু পরিবারে এতিম শিশু প্রতিপালন ও পুনর্বাসন	▪ অনুর্ধ ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এতিম শিশুদের প্রতিপালন। ▪ পারিবারিক পরিবেশে স্নেহ-ভালবাসা ও আদর-যত্নের সাথে এতিম শিশুদের লালন পালন। ▪ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদাণ। ▪ নিবাসীদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষ সাধন। ▪ পুনর্বাসন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	▪ ৬ থেকে ৯ বছর বয়সী এতিম অর্থাৎ পিতৃহীন বা পিতৃ-মাতৃহীন দরিদ্র শিশুকে ভর্তি করার পর ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সেবা প্রদান করা হয়।	▪ শিশু পরিবারে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর আসন খালি থাকা সাপেক্ষে ১ মাসের মধ্যে প্রক্রিয়া চূড়ান্তকরণ। ▪ শিশুর বয়স ১৮ বছর হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান।	সরকারি শিশু পরিবার
প্রতিবন্ধী সনদ প্রদান	▪ প্রতিবন্ধিতা সনদ প্রদান	▪ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	▪ প্রয়োজনীয় তথ্য সহ আবেদনের ১ দিনের মধ্যে	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী	▪ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমন্বিতভাবে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে	▪ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র।	▪ আবেদন প্রাপ্তির ১মাসের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

শিক্ষা কার্যক্রম	আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান ▪ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রদের আবাসিক/অনাবাসিক থাকার ব্যবস্থা ও ভরণ-পোষণ ▪ ব্রেইল পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দানের ব্যবস্থাকরণ ▪ বিনামূল্যে ব্রেইল বই ও অন্যান্য সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ▪ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রদের জন্য থাকা-খাওয়ার হোস্টেল সুবিধা প্রদান ▪ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রদের পুনর্বাসন		সম্পন্নকরণ ▪ ভর্তির পর হতে এসএসসি পরীক্ষার সময় পর্যন্ত কার্যক্রমের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান	
প্রবেশন ও আফটার কেয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন	▪ মাননীয় আদালতের নির্দেশে প্রথম ও লঘু অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান স্থগিত রেখে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে পারিবারিক/সামাজিক পরিবেশে রেখে সংশোধন ও আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করা। ▪ কারাবন্দী ব্যক্তিদের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ▪ সাজাপ্রাপ্ত শিশুদের কারাগারে না রেখে কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রবেশন অফিসার/সোশ্যাল কেইস ওয়ার্কারের তত্ত্বাবধানে কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে শিশুর মানসিকতার উন্নয়ন এবং সংশোধন। ▪ টাস্কফোর্স কমিটির সহায়তায় কারাগারে বন্দী শিশু কিশোরদের মুক্ত করে/কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থানান্তর	▪ সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক সাজা প্রাপ্ত প্রবেশনার/ব্যক্তি ▪ আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু/কিশোর ▪ মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা, বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, অস্ত্র আইন ও মাদক দ্রব্য সংশ্লিষ্ট আইনে দন্ডপ্রাপ্ত নারী ব্যতীত ১ বছরের অধিক যে কোন মেয়াদে কারাদন্ড প্রাপ্ত কোন নারী যিনি রেয়াতসহ শতকরা ৫০ ভাগ কারাদন্ড ভোগ করেছেন।	▪ বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা/প্রদত্ত আদেশ ▪ পুনর্বাসনের বিষয়ে অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি/উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যক্রম প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির অনুমোদন প্রাপ্তির পর ২০ কর্মদিবসের মধ্যে।	প্রবেশন অফিস জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে আর্থ-সামাজিক	▪ কম্পিউটার ▪ দর্জি বিজ্ঞান	▪ শহর এলাকার শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব নারী	▪ আসন খালি সাপেক্ষে আবেদনের সাথে সাথে এবং ভর্তির পর কোর্স ভেদে ৩-৬ মাস পর্যন্ত।	শহর সমাজসেবা কার্যালয়

ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ				
স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ নিবন্ধন তত্ত্বাবধান	▪ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনের নামকরণের ছাড়পত্র প্রদান। ▪ ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশের ২(চ)ধারায় বর্ণিত সেবামূলক কার্যক্রমে আগ্রহী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/বেসরকারি এতিমখানা/ক্লাব নিবন্ধন	▪ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে আগ্রহী সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সংস্থা, সমিতি ইত্যাদি।	▪ নিবন্ধন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর ২০ কর্ম দিবস; ▪ নামের ছাড়পত্র প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর ৭ কর্ম দিবস	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান	▪ ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এতিম শিশুদের প্রতিপালন ▪ স্নেহ-ভালবাসা ও আদর-যত্নের সাথে লালন পালন ▪ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ▪ শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষতা সাধন ▪ শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা ▪ পুনর্বাসন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	▪ বেসরকারি এতিমখানার ৫-৯ বছর বয়সী এতিম অর্থাৎ পিতৃহীন বা পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র শিশুর শতকরা ৫০ ভাগ শিশু।	▪ বেসরকারি এতিমখানা কর্তৃক ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের আবেদন প্রাপ্তির ৭ মাস পর।	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি: সুফল নেই উপকারভোগীদের

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে তেমন কোন সুফল পাচ্ছেন না সুবিধাভোগীরা। দেশের দরিদ্র ও অস্বচ্ছল মানুষকে বিশেষ সুবিধা দিতে বিগত বাজেটগুলোতে বাড়ানো হয়েছে এ কর্মসূচির মোট বরাদ্দ ও সুবিধাভোগীর সংখ্যা। কিন্তু জনপ্রতি ভাতা বেড়েছে খুবই সামান্য। পণ্য মূল্য বাড়ার কারণে যে হারে টাকার মান কমেছে, সে হিসেবে বাড়েনি ভাতার পরিমাণ। বিগত পাঁচ অর্থ বছরের বাজেট ও মূল্যস্ফীতির হার পর্যালোচনা করে পাওয়া গেছে এসব তথ্য। গত পাঁচ বছরে ভাতা বেড়েছে ৫০ থেকে ১০০ টাকা। অথচ ওই সময়ে ভাতা বাড়ার তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে বেশি। গত পাঁচ বচরের মূল্যস্ফীতির হিসেবে যেসব সুবিধাভোগীর ভাতা ৫০ টাকা বেড়েছে, তারা নেতিবাচক অবস্থানে রয়েছে, আর যাদের ভাতা ১০০ টাকা বেড়েছে তারা খুবই সামান্য পরিমাণে ইতিবাচক অবস্থানে রয়েছে।

পণ্য মূল্য বাড়ার কারণে গত পাঁচ বছরে যে হারে টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে সে তুলনায় ভাতা বাড়ার হার কম। ফলে নিট (প্রকৃত) হিসেবে এ বৃদ্ধি সুবিধাভোগীদের মধ্যে তেমন কোন ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরকে ভিত্তি বছর ধরে ভোক্তামূল্য সূচকে যে হিসাব করেছে সে অনুযায়ী এই ভাতা বৃদ্ধির হার খুবই নগণ্য। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে ১০০ টাকার যে পণ্য কেনা যেত, সেই একই পরিমাণে পণ্য কিনতে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে লেগেছে ২২১.৫৩ টাকা। পাঁচ বছর পরে অর্থাৎ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে একই পরিমাণ পণ্য কিনতে লাগছে ২৯৬.৫৮ টাকা। এ হিসেবে গত পাঁচ বছরে একই পরিমাণ পণ্য কিনতে বেশি

ব্যয় হচ্ছে ৭৫.০৫ টাকা। পণ্য মূল্য বাড়ার কারণে টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে ৭৫.০৫ টাকা। শতকরা হিসেবে গত ৫ বছরে টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে প্রায় ৩৪ ভাগ। একই সময়ে গড়ে প্রতি বছর টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে ৬.৮%। অর্থাৎ এই হারে বেড়েছে জীবন যাত্রার ব্যয়। পাঁচ বছরে বয়স্ক ও বিধবা ভাতা বেড়েছে ২০ শতাংশ। ওই সময়ে পণ্য মূল্য বাড়ার কারণে টাকার মান কমেছে ৩৪ শতাংশ। ফলে ৫ বছরের তুলনায় এই দুই কর্মসূচির আওতায় যারা বাড়তি ভাতা পাচ্ছেন, প্রকৃত হিসেবে তাদের ভাতার হার কমেছে ১৪ শতাংশ। এছাড়া অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ও মাতৃত্বকালীন ভাতা যারা পাচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে টাকার অবমূল্যায়ন বাদ দিলে প্রকৃত হিসেবে ভাতার হার বেড়েছে মাত্র ৬ শতাংশ।

গত পাঁচ বছরে ভাতা ও পণ্য মূল্য বাড়ার তুলনামূলক চিত্র

কর্মসূচির নাম	ভাতা বৃদ্ধির পরিমাণ	ভাতা বৃদ্ধির হার	পণ্য মূল্য বৃদ্ধির হার	প্রাপ্ত সুবিধা হ্রাস/বৃদ্ধির হার
বয়স্ক ভাতা	৫০	২০	৩৪	-১৪
বিধবা ভাতা	৫০	২০	৩৪	-১৪
প্রতিবন্ধী ভাতা	১০০	৪০	৩৪	+০৬
মাতৃত্ব ভাতা	১০০	৪০	৩৪	+০৬

২০২২ সালের মধ্যে সবার জন্য সামাজিক সুরক্ষা

২০২২ সালের মধ্যে দেশের প্রায় সব গরীব মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাব অনুযায়ী নবজাতক শিশু থেকে শুরু করে ৯০ বছরের বেশি বয়সী গরীব মানুষ এ সুবিধা পাবেন। শিশু, নারী ও বয়স্ক ব্যক্তিরা মাসে অন্তত ৮০০ টাকা ভাতা পাবে। তবে কর্মোপযোগী পুরুষেরা আর্থিক সহায়তার বদলে কাজের সুযোগ পাবেন। আর সব বয়সী প্রতিবন্ধীরা পাবেন মাসে অন্তত এক হাজার ৬০০ টাকা। এভাবে দরিদ্র মানুষের পুরো জীবনচক্রকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা হবে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রের খসড়ায় এসব সুবিধা নিশ্চিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আগামী অর্থবছর থেকে দেশের অর্ধেক দরিদ্র মানুষ এ সুবিধা পাবেন। এ কৌশলপত্রের মেয়াদ ধরা হয়েছে ২০১৫-১৬ থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত। এর পরের পাঁচ বছরের রূপরেখাও রয়েছে এ কৌশলপত্রে। প্রথমবারের মতো এ ধরনের কৌশলপত্র তৈরি করছে সরকার। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) কৌশলপত্র খসড়া প্রণয়নে করছে। বর্তমানে তিন কোটি ৫৭ লাখ মানুষ দরিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। কৌশলপত্রের খসড়ায় একজন মানুষের জীবনচক্রকে গুরুত্ব দিয়ে কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কৌশলপত্রের আলোকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। মূলত দরিদ্র্যদের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া হবে। শিশু, কর্মোপযোগী নারী-পুরুষ, বয়স্ক-সবাইকে ভাতা কিংবা কাজের সুযোগ করে দেওয়া হবে। তবে চলমান কর্মসূচিগুলোও অব্যাহত থাকবে এসব কর্মসূচির মেয়াদ আর বাড়বে না।

জীবনচক্র: সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল অনুযায়ী দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারের চার বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য ৮০০ টাকা দেওয়া হবে। তবে শর্ত থাকবে, প্রতি পরিবারে দুজন শিশুর বেশি এ সুবিধা পাবে না। ৭৫ লাখ দরিদ্র শিশু এ সুবিধার আওতায় আসবে। অন্যদিকে, দরিদ্র পরিবারের সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গামী সব শিশু মাসে ৮০০ টাকা করে উপবৃত্তি বা সমপরিমাণ সুবিধা পাবে। এতে এক কোটি ৭৯ লাখ বিদ্যালয়গামী দরিদ্র শিশু উপকার পাবে। এর পাশাপাশি প্রতিবন্ধী সুবিধা, বিদ্যালয়ে খাবার ব্যবস্থা, এতিমদের জন্য বিশেষ কর্মসূচিও থাকবে। ১৯ থেকে ৫৯ বছর বয়সী কর্মোপযোগী দরিদ্র নারী-পুরুষদের জন্য আর্থিক সহায়তা কিংবা কাজের সুযোগ করে দেওয়া হবে। পুরুষদের ক্ষেত্রে শিক্ষা সমাপ্ত ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে কর্মসূচি নেওয়া হবে। আর বেকারদের জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি থাকবে। তবে পুরুষদের নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়া হবে না। অন্যদিকে বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, দুস্থ, একক মাতা, বেকার একক নারীদের মাসে ৮০০ টাকা ভাতা দেওয়া হবে। এছাড়া মাতৃস্বাস্থ্য

নিশ্চিত করতে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও অর্থ সহায়তা দেওয়া হবে। এভাবে ৩২ লাখ দরিদ্র নারীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে সহায়তা পাবেন। আর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বেকার, মাতৃত্ব, অসুস্থতা ও দুর্ঘটনা বিমা চালুসহ জাতীয় সামাজিক বীমা কর্মসূচির জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে বেসরকারি খাতের চাকুরিজীবীদের পেনশনের আওতায় আনার সুপারিশ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় পেনশনভোগীরা মাসে কমপক্ষে ৮০০ টাকা পাবেন। অন্যদিকে শিশু, বয়স্কসহ সব বয়সী প্রতিবন্ধীরা মাসে ১ হাজার ৬০০ টাকা ভাতা পাবেন। আর ৯০ বছর বয়সী সব নাগরিক মাসে তিন হাজার টাকা পাবেন। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, দলিত, হিজড়া, চা-বাগানের শ্রমিক এইডসে আক্রান্ত মানুষের জন্য বিশেষ কর্মসূচি থাকবে। পরিবেশজনিত বিপর্যয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যও বিশেষ কর্মসূচি নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে কৌশলপত্রে।

বিনিয়োগ: কৌশলপত্রে কী পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে, তার একটি চিত্র দেওয়া হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট সাড়ে ৩৬ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হবে। প্রতিবছর এ খাতের পরিমাণ বাড়ানো হবে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট সাড়ে ৬৬ হাজার ২০০ কোটি টাকা খরচ হবে। কৌশলপত্রে আরও বলা হয়েছে, ২০২১ সাল পর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো তদারকি করে থাকে। ২০২২ সালে এ তদারকির জন্য পৃথক একটি সংস্থা। এর নাম হবে সামাজিক নিরাপত্তা সংস্থা। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তায় ১৪৫টি কর্মসূচি রয়েছে। এগুলো বাস্তবায়ন করছে ৩৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ।

গাইবান্ধা জেলার বয়স্ক ভাতাভোগী সংক্রান্ত তথ্য

উপজেলা	ভাতাভোগীর সংখ্যা	ভাতাগ্রহীতার সংখ্যা
গাইবান্ধা সদর	৭৮২৮	৭৮২৮
গোবিন্দগঞ্জ	১০৯৪১	১০৯৪১
সাদুল্যাপুর	৬৩৯১	৬৩৯১
সুন্দরগঞ্জ	৯৪২৬	৯৪২৬
ফুলছড়ি	৩৪৮৩	৩৪৮৩
সাঘাটা	৫৯৭২	৫৯৭২
পলাশবাড়ী	৫৫১০	৫৫১০
শহর সমাজ সেবা অধিদপ্তর	১১৭৭	১১৭৭
সর্বমোট =	৫০,৭২৮	৫০,৭২৮

গাইবান্ধা জেলায় বয়স্ক ভাতার বরাদ্দকৃত বাজেট সংক্রান্ত তথ্য

উপজেলা	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ	বিতরণের হার
গাইবান্ধা সদর	২৮১৮০৮০০	২৮১৮০৮০০	১০০%
গোবিন্দগঞ্জ	৩৯৩৮৭৬০০	৩৯৩৮৭৬০০	১০০%
সাদুল্যাপুর	২৩০০৭৬০০	২৩০০৭৬০০	১০০%
সুন্দরগঞ্জ	৩৩৯৩৩৬০০	৩৩৯৩৩৬০০	১০০%
ফুলছড়ি	১২৫৩৮৮০০	১২৫৩৮৮০০	১০০%
সাঘাটা	২১৪৯৯২০০	২১৪৯৯২০০	১০০%
পলাশবাড়ী	১৯৮৩৬০০০	১৯৮৩৬০০০	১০০%
শহর সমাজ সেবা অধিদপ্তর	৪২৩৭২০০	৪২৩৭২০০	১০০%
সর্বমোট =	১৮,২৬,২০,৮০০	১৮,২৬,২০,৮০০	১০০%

গাইবান্ধা জেলার মুক্তিযোদ্ধা ভাতাভোগী সংক্রান্ত তথ্য

উপজেলা	ভাতাভোগীর সংখ্যা	ভাতাগ্রহীতার সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ
গাইবান্ধা সদর	৪১৩	৪১৩	২,০৬৫,০০০০
গোবিন্দগঞ্জ	২৪১	২৪১	১,২০,৫০০০০
সাদুল্যাপুর	১৬৪	১৬৪	৮,২০,০০০০
সুন্দরগঞ্জ	২২৯	২২৯	১,১৪,৫০০০০
ফুলছড়ি	২৭৪	২৭৪	১,৩৭,০০০০০
সাঘাটা	৫১২	৫১২	২,০৬,০৫০০০০
পলাশবাড়ী	১৬৮	১৬৮	৮৪,০০০০০
সর্বমোট =	২০১০	২০১০	১০,০৫,০০০০০

গাইবান্ধা জেলার প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী সংক্রান্ত তথ্য

উপজেলা	ভাতাভোগীর সংখ্যা	ভাতাগ্রহীতার সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ
গাইবান্ধা সদর	১১৩০	১১৩০	৪৯,৬৩,৫০০
গোবিন্দগঞ্জ	১৫৫৮	১৫৫৮	৭০,১১,০০০
সাদুল্যাপুর	৮৯০	৮৯০	৪০,০৫,০০০
সুন্দরগঞ্জ	১৩৪৫	১৩৪৫	৪৬,০৫২,৫০০
ফুলছড়ি	৪৬৯	৪৬৯	২১,১০,৫০০
সাঘাটা	৮৩৯	৮৩৯	৩৭,৭৫,৫০০
পলাশবাড়ী	৭৮৩	৭৮৩	৩৫,২৩,৫০০
শহর সমাজ সেবা অধিদপ্তর	২১১	২১১	৯,৪৯,৫০০
সর্বমোট =	৭২২৫	৭২২৫	৩২,৩৯,১০০০

গাইবান্ধা জেলার বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতাভোগী সংক্রান্ত তথ্য

উপজেলা	ভাতাভোগীর সংখ্যা	ভাতাগ্রহীতার সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ
গাইবান্ধা সদর	৩৩২৩	৩৩২৩	১,১৯,৬২,৮০০
গোবিন্দগঞ্জ	৪৬০৪	৪৬০৪	১,৬৫,৭৪,৪০০
সাদুল্যাপুর	২৮১৩	২৮১৩	১,০১,২৬৮০০
সুন্দরগঞ্জ	৪০৯৩	৪০৯৩	১,৪৭,৩৪,৮০০
ফুলছড়ি	১৮৩১	১৮৩১	৬৫,৯১,৬০০
সাঘাটা	২৬১৩	২৬১৩	৯৪,০৬,৮০০
পলাশবাড়ী	২৩০৩	২৩০৩	৮২,৯০,৮০০
শহর সমাজ সেবা অধিদপ্তর	২৬১	২৬১	৯,৩৯,৬০০
সর্বমোট =	২১,৮৪১	২১,৮৪১	৭,৮৬,২৭,৬০০

গাইবান্ধাজেলার বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতার বরাদ্দকৃত বাজেট সংক্রান্ত তথ্য:

উপজেলা	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ	বিতরণের হার
গাইবান্ধা সদর	১,১৯,৬২,৮০০	১,১৯,৬২,৮০০	১০০%
গোবিন্দগঞ্জ	১,৬৫,৭৪,৪০০	১,৬৫,৭৪,৪০০	১০০%
সাদুল্যাপুর	১,০১,২৬,৮০০	১,০১,২৬,৮০০	১০০%
সুন্দরগঞ্জ	১,৪৭,৩৪,৮০০	১,৪৭,৩৪,৮০০	১০০%
ফুলছড়ি	৬৫,৯১,৬০০	৬৫,৯১,৬০০	১০০%
সাঘাটা	৯৪,০৬,৮০০	৯৪,০৬,৮০০	১০০%
পলাশবাড়ী	৮২,৯০,৮০০	৮২,৯০,৮০০	১০০%
শহর সমাজ সেবা অধিদপ্তর	৯,৩৯,৬৮০	৯,৩৯,৬৮০	১০০%
সর্বমোট =	৭,৮৬,২৭,৬০০	৭,৮৬,২৭,৬০০	১০০%

উপজেলাভিত্তিক ভিজিডি এর তথ্য (২০১৪-২০১৫)

উপজেলা	কত জন	প্রতি মাসের খাদ্যর পরিমাণ
গাইবান্ধা সদর	২০৪৬	৩০ কেজি
গোবিন্দগঞ্জ	২০৬৯	৩০ কেজি
পলাশবাড়ি	২০১৮	৩০ কেজি
সাদুল্ল্যাপুর	২০৬৯	৩০ কেজি
সাঘাটা	২১৩০	৩০ কেজি
সুন্দরগঞ্জ	২৩৩৮	৩০ কেজি
ফুলছড়ি	২৩৯১	৩০ কেজি
সর্বমোট=	১৫,০৬১ জন	-

উপজেলাভিত্তিক মাতৃত্ব ভাতা (২০১৪-২০১৫)

উপজেলা	কত জন	প্রতি মাসের ভাতার পরিমাণ
গাইবান্ধা সদর	৬২৪	৫০০/=
গোবিন্দগঞ্জ	৮১৬	৫০০/=
সাদুল্ল্যাপুর	৫২৮	৫০০/=
সুন্দরগঞ্জ	৭২০	৫০০/=
ফুলছড়ি	৩৩৬	৫০০/=
সাঘাটা	৪৮০	৫০০/=
পলাশবাড়ী	৪৩২	৫০০/=
সর্বমোট=	৩,৯৩৬ জন	-

মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর যে বিষয় প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে

প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল	প্রতি ব্যাচের সংখ্যা
দর্জি বিজ্ঞান/এ্যাম্বডারী	৩ মাস	১০ জন
মোমবাতি তৈরি/কারচুপি	৩ মাস	১০ জন
সোপিস তৈরি	৩ মাস	১০ জন

বিউটি ভিশন	৩ মাস	১০ জন
ব্লক বাটিক	৩ মাস	১০ জন

ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল (শুধু সদর পৌরসভা) ২০১৪-২০১৫

পৌরসভা	মোট সংখ্যা	প্রতিমাসে টাকার পরিমাণ
গাইবান্ধা পৌরসভা	৮২৮ জন	৫০০/=
গোবিন্দগঞ্জ পৌরসভা	৩০০ জন	৫০০/=
মোট=	১,১২৮ জন	

এক নজরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নানামুখী সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। উল্লেখযোগ্য নিম্নরূপ:

- ভাতাভিত্তিক যে সকল কর্মসূচি রয়েছে এর অর্থের পরিমাণ বাস্তব ভিত্তিক নয়।
- ভাতায় নাম অন্তর্ভুক্তকরণে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে। বিশেষত চেয়ারম্যান, মেম্বারদের ঘনিষ্ঠ লোকজন এসকল ভাতা ভোগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে বলে বিভিন্ন সময় অভিযোগ পাওয়া গেছে।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সেবা সুবিধাভোগীর সংখ্যা এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদার তুলনায় অনেক কম।
- ভাতা সুবিধাভোগী হিসেবে নাম অন্তর্ভুক্তকরণে উৎকোচ প্রদানের অভিযোগ রয়েছে।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে যে সকল ভাতা প্রদান করা হয় তাতে বরাদ্দের চেয়ে কম প্রদানের অভিযোগ রয়েছে।
- চেয়ারম্যান/মেম্বারদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণের অভাব।
- সরকারি মনিটরিং কম থাকা।
- ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ কম থাকা ইত্যাদি।

সুপারিশসমূহ

- উপকারভোগী নির্ধারণের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয় সেখানে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা।
- বয়স্ক ভাতা,বিধবা ভাতাসহ সবগুলোর কার্ডের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- ইউনিয়নের সকল নাগরিককে তাদের উপর ধার্যকৃত ট্যাক্স অবশ্যই আদায় করেতে হবে।
- সামাজিক নিরাপত্তাজাল কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের মত বিনিময় কর্মশালার আয়োজন করা।
- এ বিষয়ে জনসাধারণের সাথে উন্মুক্ত সংলাপের আয়োজন করা।
- উন্মুক্ত বাজেট পেশ করা।
- ইউনিয়ন পরিষদে সিটিজেন চার্টার টাঙিয়ে দেয়া।
- ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো সক্রিয়/কার্যকর করা।
- ইউপি সদস্যের উদ্যোগে ওয়ার্ডভিত্তিক সভা করা।
- সর্বসাধারণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ এর বিভিন্ন সেবা/কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন সেবা/কার্যক্রম সম্পর্কে মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা।

বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অধীনে ভাতা দেয়ার পরিমাণ খুবই নগণ্য। বর্তমান বাজার পরিস্থিতির মূল্যায়নে এ ভাতা দিয়ে উপকারভোগীদের উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব নয়। যে উদ্দেশ্যে ভাতা দেয়া হচ্ছে সেই উদ্দেশ্য কিছুটা পূরণের জন্য ভাতার পরিমাণ আরো বাড়ানো প্রয়োজন। প্রতিবছর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা বাড়ানোর সময় মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় করে বাড়ানো দরকার।

ভোক্তা অধিকার পরিস্থিতি

ভোক্তার অধিকার তখনই জন্মায় যখন কোন নাগরিক তার খাদ্যের অধিকার পায়। আর 'পর্যাপ্ত খাদ্য অধিকার বলতে স্বাধীনতা ও অধিকার দুটিকেই বোঝায়। স্বাধীনতা ক্ষুধামুক্তির প্রতীক আর অধিকার বলতে বোঝায় খাদ্য অধিকার যা পুষ্টির যোগান দেয়, যা সম্পদের প্রাচুর্য থেকে মুক্ত, যা সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণ যোগ্য, যা নির্ভেজাল ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, যা শারীরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রবেশযোগ্য এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যার উৎপাদন টিকে থাকবে।' পণ্য ও সেবা যখন বিপণনের মাধ্যমে মানুষের ভোগে আসতে থাকে তখন থেকে ভোক্তা অধিকার সচেতনতার জন্ম। বিষয়টি প্রথমদিকে সুসংহত ছিলনা। ভোক্তা অধিকার রক্ষায় সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু করেন মার্কিন নাগরিক মি. রালফ নাদের। তিনি প্রথম ভাবেন যে খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত হওয়ার পরও খাদ্যে ভেজাল বা দূষিত খাবার সরবরাহের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায়ীরা পণ্য বাজারজাত করতে মিথ্যা বিজ্ঞাপন ও খাবার সরবরাহের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায়ীরা পণ্য বাজারজাত করতে মিথ্যা বিজ্ঞাপন ও প্রতারণার আশ্রয় নিত, মিশ্রিত করত ভেজাল। প্রতারিত, নির্যাতিত অসহায় ক্রেতারা বিক্ষুব্ধ হলেও তাদের কিছুই করার ছিল না। নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ১৯৬২ সালে জন এফ কেনেডি ভোক্তা অধিকার বিল পাশের মাধ্যমে ভোক্তাদের ৪টি অধিকারের উপর জোর দেন।

ক. ভোক্তার অধিকার আছে নিরাপদ খাদ্য ভোগ করার।
খ. খাদ্যের বা পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে জানান অধিকার।
গ. ন্যায্য মূল্যে পছন্দমত পণ্য ক্রয়ের অধিকার এবং
ঘ. স্বার্থবিরোধী যে কোন বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করার।

যে সকল পর্যায়ে ক্রেতার স্বার্থ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়- সেইসব পর্যায়ে ক্রেতার বা ভোক্তার প্রতিনিধিত্ব ও মত প্রকাশের থাকবে অধিকার। সময়ের সাথে এই অধিকারগুলো স্বীকৃত হয় ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। প্রতিবেশী দেশ ভারতে ১৯৮৬ সালে পাশ হয় 'কনজ্যুমার পোটেকশন এ্যাক্ট'। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজারেশন অব কনজ্যুমার ইউনিয়ন বর্তমানে কনজ্যুমার ইন্টারন্যাশনাল ১৯৭৫ সালে ভোক্তার অধিকার রক্ষায় আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বিশ্বব্যাপী ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ৮টি মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৯৫ সালে আমাদের দেশে 'কনজ্যুমার প্রোটেকশন এ্যাক্ট' নামে একটি আইনের খসড়া তৈরি হয় যা ২০০৯ সালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ নামে জাতীয় সংসদে পাশ হয়।

আইনে বর্ণিত ভোক্তা অধিকার, দায় দায়িত্ব, ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্য-অপরাধ এবং দ- সম্পর্কে যা বলা আছে তা হলো-

ভোক্তার অধিকা কি কি: জাতিসংঘ স্বীকৃত ভোক্তার অধিকার ৮টি।

- মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার (সংবিধানে বিধৃত)
- তথ্য পাওয়ার অধিকার (তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এ বিধৃত)
- নিরাপদ পণ্য ও সেবা পাওয়ার অধিকার।
- পছন্দের অধিকার।
- জানার অধিকার।
- প্রতিকার পাওয়ার অধিকার।
- ভোক্তার অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা লাভের অধিকার।
- সুস্থ পরিবেশের অধিকার।

আইনের উদ্দেশ্য

- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
- ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ।
- ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘন জনিত অভিযোগ নিষ্পত্তি।

- নিরাপদ পণ্য বা সেবা পাওয়ার ব্যবস্থা।
- পণ্য বা সেবা ব্যবহারের ক্ষতিগ্রস্ত ভোক্তাকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা।
- পণ্য বা সেবা ক্রয়ে প্রতারণা রোধ।
- ভোক্তা অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে গণ সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি।

আইনটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। প্রত্যেক জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

ভোক্তা

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ব্যতীত যিনি সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে বা সম্পূর্ণ বাকিতে পণ্য অথবা সেবা ক্রয় করেন, আংশিক মূল্য পরিশোধ করেন বা আংশিক বাকিতে পণ্য অথবা সেবা ক্রয় করেন, কিস্তিতে পণ্য অথবা সেবা ক্রয় করেন, যিনি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয় করে বিক্রয় করেন।

ভোক্তার দায়িত্ব

ভোক্তা অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানা, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের সুফল সম্পর্কে জানা, ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্যের কুফল সম্পর্কে জানা, যাচাই-বাছাই করে যথাযথ পণ্য বা সেবা সঠিক মূল্যে কেনা, ভোক্তা অধিকার বাস্তবায়নে সংঘটিত ও স্বোচ্চার হওয়া, অভিযোগ দায়েরে উৎসাহিত হওয়া।

বিক্রেতা

কোন পণ্যের উৎপাদনকারী বা প্রস্তুতকারী, সরবরাহকারী, পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা হিসেবে গণ্য হবেন।

ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্য ও অপরাধ

নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোন পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা। জেনে শুনে ভেজাল মিশ্রিত পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা। স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক নিষিদ্ধ দ্রব্য কোন খাদ্য পণ্যের সাথে মিশ্রিত ও বিক্রয় করা। মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করা। পরিমাপে কারচুপি করা। ওজনে কারচুপি করা। দৈর্ঘ্য পরিমাপক ফিতা বা অন্য কিছুতে কারচুপি করা। বাটখাড়া বা ওজন পরিমাপক যন্ত্রে কারচুপি করা। কোন নকল পণ্য বা ঔষধ প্রস্তুত বা উৎপাদন করা। মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা। নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন কার্য করা যাতে সেবা গ্রহণকারীর জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে। অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ করা। অবহেলা, দায়িত্বহীনতা দ্বারা সেবা গ্রহীতার অর্থ বা স্বাস্থ্যহানি ঘটানো ইত্যাদি। কোন পণ্য মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করার এবং মোড়কের গায়ে পণ্যের উৎপাদন খুচরা বিক্রয় মূল্য, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করা। আইনানুগ বাধ্যবাধকতা অমান্য করে দোকান বা প্রতিষ্ঠানে সহজে দৃশ্যমান কোন স্থানে পণ্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করা। আইনানুগ বাধ্যবাধকতা অমান্য করে দোকান বা প্রতিষ্ঠানের সেবার মূল্য তালিকা সংরক্ষণ না করা এবং সংশ্লিষ্ট স্থানে বা সহজে দৃশ্যমান কোন স্থানে উক্ত তালিকা লটকায়ে প্রদর্শন না করা।

যিনি অভিযোগকারী হতে পারেন

কোন ভোক্তা, একই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক ভোক্তা, কোন আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন ভোক্তা সংস্থা, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ বা তার পক্ষে অভিযোগ দায়েরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সরকারি কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী।

যেখানে অভিযোগ দায়ের করা যাবে

- মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১নং কাওরান বাজার (টিসিবি ভবন, ৮ম তলা), ঢাকা।
- প্রত্যেক জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

অভিযোগ দায়েরের সময়সীমা

কারণ উদ্ভব হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করতে হবে।

অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি

অভিযোগ অবশ্যই লিখিত হবে, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ওয়েব সাইট ইত্যাদি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে করা যাবে এবং অভিযোগকারীর পূর্ণাঙ্গ নাম, পিতা-মাতার নাম, ঠিকানা, ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল নং (যদি থাকে) এবং পেশা উল্লেখ থাকতে হবে।

ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্য এবং দ-

ক. অনধিক ১ বছর কারাদ- বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদ- বা উভয় দ-যোগ্য অপরাধ।

- পণ্যের মোড়কে ব্যবহার না করা বা মোড়কের গায়ে খুচরা বিক্রয় মূল্য ইত্যাদি লেখা না থাকা।
- পণ্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করা, সেবার মূল্য তালিকা সংরক্ষণ ও প্রদর্শন না করা।
- পণ্য বা সেবা মূল্য তালিকা লটকায়ে প্রদর্শন না করা।
- নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্যে কোন পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা।
- প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করা।
- ওজনে, বাটখাড়া বা ওজন পরিমাপক যন্ত্রে কারচুপি করা।
- পরিমাপে, দৈর্ঘ্য পরিমাপক ফিতা বা অন্য কিছুতে কারচুপি করা।
- মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা।

খ. অনধিক ১ বছর কারাদ- বা অনধিক ২ লক্ষ টাকা অর্থদ- বা উভয় দ- যোগ্য অপরাধ

- মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতাকে প্রতারত করা।

গ. অনধিক ২ বছর কারাদ- বা অনধিক ১ লক্ষ টাকা অর্থদ- বা উভয় দ-যোগ্য অপরাধ

- অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ করা।

ঘ. অনধিক ৩ বছর কারাদ- বা অনধিক ২ লক্ষ টাকা অর্থদ- বা উভয় দ-যোগ্য অপরাধ

- জেনে শুনে ভেজাল মিশ্রিত পণ্য বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা।
- খাদ্য পণ্যের ক্ষতিকর নিষিদ্ধ দ্রব্য মিশ্রিত ও বিক্রয় করা।
- পণ্যের নকল প্রস্তুত বা উৎপাদন করা।
- সেবা গ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্নকারী কার্য করা।
- অবহেলা, দায়িত্বহীনতা দ্বারা সেবা গ্রহীতার অর্থ বা স্বাস্থ্যহানি ঘটানো।

ঙ. অপরাধ পুনঃসংগঠনের দ-

উক্ত অপরাধসমূহে দন্ডিত ব্যক্তি পুনরায় একই অপরাধ করলে তিনি সর্বোচ্চ দ-ের দ্বিগুণ দ- দ-িত হবে।
বিঃদ্রঃ উক্ত দ- ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদেয়। বিশেষ ট্রাইবুনালে সর্বোচ্চ মৃত্যুদ- হতে পারে।

অভিযোগ প্রতিকার

ফৌজদারী প্রতিকার

ভোক্তা অধিকার বিরোধী অপরাধসমূহ ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর উচ্চতর শাস্তি বিধান কল্পে ম্যাজিস্ট্রেট অদালতের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট বিশেষ ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করতে পারবেন।

অভিযোগকারী ফৌজদারী মামলা সরাসরি দায়ের করতে পারবেন না।

অভিযোগ দায়ের হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ফৌজদারী মামলা দায়েরে লক্ষ্যে অভিযোগপত্র ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা বিশেষ ট্রাইবুনালে দাখিল করতে হবে।

বিচারে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদ- বা অর্থ দ- বা উভয়দ-সহ মালামাল বাজেয়াপ্ত করতে পারবে।

অভিযোগকারী জরিমানার ২৫% তাৎক্ষণিকভাবে প্রাপ্ত হবেন।

দেওয়ানী প্রতিকার

কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যক্রম সূচিত হওয়ার কিংবা ঐ ব্যক্তি অনুরূপ কার্যের জন্য ফৌজদারী অপরাধে দ-িত হওয়ার কারণে, ক্ষতিগ্রস্ত কোন ভোক্তা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আর্থিক মূল্যে নিরূপণযোগ্য ও নিরোপিত ক্ষতির অনূর্ধ ৫ গুণ পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করে স্থানীয় অধিক্ষেত্রের যুগ্ম জেলা জজের আদালতে দেওয়ানী মামলা দায়ের করতে পারবেন।

প্রশাসনিক প্রতিকার

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা সমীচিন মনে করলে ফৌজদারী মামলা দায়েরের পরিবর্তে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় শুধু জরিমানা আরোপ, ব্যবসার লাইসেন্স বাতিল বা ব্যবসায়িক কার্যক্রম সাময়িক বা স্থানীয়ভাবে স্থগিত করতে পারবেন।

প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আরোপিত ও আদায়কৃত জরিমানার ২৫% অভিযোগকারী প্রাপ্ত হবেন।

ফৌজদারী আপীল

সংক্ষুব্ধ পক্ষ আদেশ প্রদানে ৬০ দিনের মধ্যে স্থানীয় অধিক্ষেত্রের সেশন জজের আদালতের আপীল দায়ের করতে পারবেন।

দেওয়ানী আপীল

যুগ্ম জেলা জজের আদালতের রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে ৯০ দিনের মধ্যে কেবল হাইকোর্ট বিভাগের আপীল দায়ের করা যাবে।

রিটি পিটিশন

প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন দাখিল করতে পারবেন।

প্রশাসনের পদক্ষেপ

ভোক্তার অধিকারবিরোধী কার্যক্রম দেখার জন্য প্রতিটি জেলায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস রয়েছে। এই অফিসের কর্মকর্তাগণ পর্যবেক্ষণ পূর্বক আইন ও নীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গাইবান্ধা জেলায় প্রত্যেক মাসে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। নিম্নে ২০১৫ সালের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হলো-

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তারিখ	মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার স্থান (উপজেলা/থানা)	মামলার সংখ্যা	দ-িত ব্যক্তির সংখ্যা	অর্থদ-
১৯.০১.২০১৫	০১টি	সুন্দরগঞ্জ	০১টি	০১ জন	১,০০০/-
১০.০৩.২০১৫	০১টি	গোবিন্দগঞ্জ	০২টি	০৩ জন	১০,৫০০/-
২৩.০৩.২০১৫	০১টি	সাঘাটা	০১টি	০১ জন	২৫,০০০/-
১১.০৪.২০১৫	০১টি	সুন্দরগঞ্জ	০১টি	০২ জন	৬,০০০/-
২১.০৪.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	২,০০০/-

১৩.০৫.২০১৫	০১টি	সুন্দরগঞ্জ	০১টি	০৩ জন	৯,০০০/-
১২.০৫.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০৪টি	০৪ জন	৮,৩০০/-
১১.০৫.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০৪টি	০৪ জন	৭,৩০০/-
১২.০৫.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০৩টি	০৩ জন	৮,০০০/-
১৯.০৫.২০১৫	০১টি	সুন্দরগঞ্জ	০৫টি	০৫ জন	১৫,৫০০/-
২০.০৫.২০১৫	০১টি	সুন্দরগঞ্জ	০১টি	০১ জন	১০,০০০/-
৩১.০৫.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৫০০/-
২৪.০৫.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৫০০/-
২৬.০৫.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	১০০/-
২৪.০৫.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০২টি	০২ জন	৩,৪০০/-
৩১.০৫.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৫০০/-
২৬.০৫.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	১,৫০০/-
২০.০৫.২০১৫	০১টি	পলাশবাড়ী	০২টি	০২ জন	১৩,০০০/-
০৭.০৬.২০১৫	০১টি	সুন্দরগঞ্জ	০৩টি	০৩ জন	৬,০০০/-
১৪.০৬.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০৩টি	০৩ জন	২৩,০০০/-
০৪.০৬.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৩,০০০/-
০২.০৬.২০১৫	০১টি	সাদুল্যাপুর	০২টি	০২ জন	১৫,০০০/-
১৮.০৬.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	২০০/-
২৭.০৬.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০৫টি	০৫ জন	২৫,০০০/-
২৯.০৬.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৫০০/-
৩০.০৬.২০১৫	০১টি	সাদুল্যাপুর	০২টি	০২ জন	৫০০/-
২৯.০৬.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	২,০০০/-
০৮.০৭.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০২টি	০২ জন	৩,০০০/-
০৫.০৭.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৫,০০০/-
০৬.০৭.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০২টি	০২ জন	৪০০/-
০৫.০৭.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৫০০/-
০৮.০৭.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	২০০/-
০৯.০৭.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০৩টি	০৩ জন	২,২০০/-
১৪.০৭.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	২০০/-
০৯.০৭.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০২টি	০২ জন	৪০০/-
১৩.০৭.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৬,৫০০/-
১২.০৭.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৫০০/-
১৩.০৭.২০১৫	০১টি	সাদুল্যাপুর	০১টি	০১ জন	৫০০/-
০৬.০৭.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	২০০/-
১৩.০৭.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	১০,০০০/-
১৩.০৭.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৫০০/-
০৮.০৭.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০২টি	০২ জন	৭০০/-
১৩.০৭.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৩০,০০০/-
০৮.০৭.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০৩টি	০৩ জন	২,৬০০/-
২৮.০৭.২০১৫	০১টি	সাদুল্যাপুর	০৫টি	০৫ জন	১,৬০০/-

২৬.০৭.২০১৫	০১টি	গোবিন্দগঞ্জ	০৭টি	০৭ জন	৯,১০০/-
২৭.০৭.২০১৫	০১টি	সাদুল্যাপুর	০৭টি	০৭ জন	৮,১০০/-
২৮.০৭.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০৫টি	০৫ জন	৫,৫০০/-
২৮.০৭.২০১৫	০১টি	সাঘাটা	০৫টি	০৫ জন	৫,৩০০/-
৩০.০৭.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৫০০/-
০৬.০৮.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৩,০০০/-
০৯.০৮.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৩,০০০/-
০৪.০৮.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	১,০০০/-
১৩.০৮.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০৩টি	০৩ জন	৩,৮০০/-
০৫.০৮.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০২টি	০২ জন	৬,০০০/-
১১.০৮.২০১৫	০১টি	পলাশবাড়ী	০৪টি	০৪ জন	৪,৫০০/-
০৫.০৮.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০২টি	০২ জন	৪,০০০/-
১০.০৮.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৫,০০০/-
২৪.০৮.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৫,০০০/-
২৬.০৮.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৩,০০০/-
২৬.০৮.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	২,০০০/-
৩০.০৮.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৫,০০০/-
৩১.০৮.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	২০০/-
৩১.০৮.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০৩টি	০৩ জন	৪,০০০/-
২৩.০৮.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০৩টি	০৩ জন	২,৫০০/-
৩০.০৮.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	২,৫০০/-
৩১.০৮.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০২টি	০২ জন	১,৫০০/-
১৭.০৮.২০১৫	০১টি	পলাশবাড়ী	০৪টি	০৪ জন	১৭,০০০/-
৩০.০৮.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৫,০০০/-
০৩.০৯.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০২টি	০২ জন	৭,০০০/-
১৪.০৯.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	৫,০০০/-
০৩.০৯.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০১টি	০১ জন	১,০০০/-
০৭.০৯.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০২টি	০২ জন	৭,০০০/-
১৭.০৯.২০১৫	০১টি	গোবিন্দগঞ্জ	০১টি	০১ জন	৬০,০০০/-
১৬.০৯.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০৩টি	০৩ জন	২,০০০/-
৩০.০৯.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০২টি	০২ জন	১০,০০০/-
৩০.১১.২০১৫	০১টি	ফুলছড়ি	০১টি	০১ জন	২০০/-
২৬.১১.২০১৫	০১টি	সাঘাটা	০২টি	০২ জন	১,৫০০/-
২৪.১১.২০১৫	০১টি	সাঘাটা	০৭টি	০৭ জন	১৮,০০০/-
২৫.১১.২০১৫	০১টি	সাদুল্যাপুর	০১টি	০১ জন	৩,০০০/-
১৬.১১.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০৮টি	০৮ জন	৫,০০০/-
২৪.১১.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০২টি	০২ জন	১৫,০০০/-
২৫.১১.২০১৫	০১টি	গাইবান্ধা সদর	০২টি	০২ জন	৮,৩০০/-
২৫.১১.২০১৫	০১টি	গোবিন্দগঞ্জ	০২টি	০২ জন	১৫,০০০/-
২৯.১১.২০১৫	০১টি	গোবিন্দগঞ্জ	০১টি	০১ জন	৫,০০০/-

ষাটের দশকে শুরু হওয়া ভোক্তা আন্দোলন আজ পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করেছে। এবারের বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসের সঙ্গে পালিত হচ্ছে ভোক্তা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি। এটি নিশ্চয়ই এক আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত এটি একটি অধিকার আন্দোলন। অধিকার কারো কোন দয়ার দান নয়। একে আদায় করে নিতে হয় নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে। ভোক্তা আন্দোলন এক চলমান প্রক্রিয়া। আর একে প্রতিটি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয় এবং কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। বলাবাহুল্য, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন সারাবিশ্বের মানুষকে একীভূত করে ফেলেছে, এটাই বাস্তবতা। তবে একবিংশ শতাব্দীর নাগরিক হিসেবে আমাদেরকে অধিকার সচেতন ও দায়িত্বশীল হওয়ার কোন বিকল্প নেই। আসুন আজকের এই দিনে আমরা সকলে সংগঠিত, সচেতন ও দায়িত্বশীল হবার শপথ নিই এবং সমন্বিতভাবে অঙ্গীকার করি "আমার অর্থ, আমার অধিকার"।

পর্ব-তিন
গোষ্ঠীর অধিকার

০১. নারীর অধিকার
০২. গাইবান্ধা জেলার দলিত জনগোষ্ঠীর অবস্থান ও অবস্থা
০৩. প্রতিবন্ধীদের অধিকার

নারীর অধিকার

বাংলাদেশের বর্তমান নারীর অবস্থান আলোচনা করতে গেলে নানা বৈপরীত্যের সম্মুখীন হতে হয়। আজকের বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচয়ের যে ইতিবাচক নির্দেশনাগুলো রয়েছে তার অনেকটাই অগ্রসরমান তাকে ঘিরে। বাংলাদেশের নারী আজ রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল, প্রশাসন, পুলিশ ও সেনাবাহিনী সর্বত্র দৃশ্যমান এবং উল্লেখযোগ্যভাবে নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত। পরিবারের মধ্যেও তার অবস্থানের ধারণা এবং প্রতিদিনকার দিনযাপনের ক্ষেত্রে তার ভূমিকার প্রশংসনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এমডিজি (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল) পরিক্রমায় বাংলাদেশের অগ্রগতি এবং লক্ষ্যমাত্রা ছোয়ার সম্ভাবনায় নারীর অবস্থানের পরিবর্তনই অগ্রগণ্য হয়েছে। নারীর নিজস্ব জীবনে, মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু রোধে সামগ্রিকভাবে সামাজিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে যে ইতিবাচক স্বীকৃতি এসেছে সামাজিক সূচকে তার পেছনে রয়েছে শিক্ষা, মানবাধিকার, তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর বিশেষ ভূমিকা ও অবদান। তদুপরি যে প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতেই হয়, তা হলো নারীর ওপর সহিংসতার এই ভয়াবহ রূপের কারণ কি?বাংলাদেশের নারী কি প্রকৃতপক্ষেই নিরাপদ জীবন যাপন করে? নারী কি সত্যিকার অর্থে তার প্রাপ্য পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা পেয়েছে এ দেশে? বিব্রত হতে হয় এ কথা মেনে নিয়ে যে এ সমস্ত প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর হচ্ছে 'না'।

একটি বিষয় নিয়ে ২০১৪ সালে বিশেষভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংশ্লিষ্ট সবাই, তা হলো বাল্য বিবাহের আধিক্য। জানা যায় যে, বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার ৬৬ শতাংশ এবং এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যার বিয়ে হয়ে যায় ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী মেয়েদের। আবার এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নির্মূলের লক্ষ্য বহুদিন ধরেই নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে নারী ও মানবাধিকার আন্দোলনে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থাগুলো। সরকারও এ ব্যাপারে সময় সময় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমরা নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইন পেয়েছি সেই ১৯৯৭ সালেই। নারী নীতিমালা নানা চড়াই উতরাই পার হয়ে ২০১০ সালে একটা সংহত রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একই সময়ে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক নির্যাতন যা আইনের বাইরে ছিল তার বিরুদ্ধে আইন তৈরী হয়েছে, পারিবারিক সংহিসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন শিরোনামে। কিন্তু নারী নির্যাতনের প্রকোপ কমছে না কেন? এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটি আরও ভেঙ্গে এভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের নারীর এত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হওয়ার পরও নারী নির্যাতনের এবং নারীর অধিকার বঞ্চনার এই ভয়াবহ চেহারা কেন? এর একটি উত্তর হলো গণমাধ্যমগুলো এখন নারী নির্যাতনের খবর প্রকাশ অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অত্যাচার নির্যাতনের শিকার নারীরা অথবা তাদের পরিবারও এখন সাহস করে ঘটনা প্রকাশ করতে এগিয়ে আসছেন। সমাজেও এ বিষয়ে সচেতনতা বেড়েছে। রাষ্ট্র নতুন কিছু আইন কানুন তৈরী করে নারীকে এ ব্যাপারে সংরক্ষণ ও প্রতিকার দেওয়ার চেষ্টা করছে, যার ফলে নারী নির্যাতনের বিষয়টি সবার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এ কথার অবশ্যই সত্যতা ও বাস্তব ভিত্তি রয়েছে।

সিডও সনদ

সিডও তে নারীর জন্য যে সমস্ত অধিকার এর কথা বলা হয়েছে সেগুলো হল নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ, নারী পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাময়িক বিশেষ ব্যবস্থা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথার ইতিবাচক পরিবর্তন, নারী পাচার রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারীর সমান অংশগ্রহণের ব্যবস্থা, নারী ও তার সন্তানের জাতীয়তা, শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টির অধিকার, নারীর জন্য সমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা, পল্লী উন্নয়ন কাজে নারীর অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ, নারীর আইনগত ও নাগরিক অধিকার বিবাহ ও সকল পারিবারিক বিষয়ে নারী পুরুষের সমান অধিকার।

বাংলাদেশ ১৯৪৮ সালের ৬ ডিসেম্বর জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর প্রতি সব ধরণের বৈষম্য বিলোপ সনদ অর্থাৎ সিডও সনদ অনুমোদন করে। অনুমোদনের পর থেকে এখন পর্যন্ত সিডও সনদের বেশ কিছু ধারা বাংলাদেশ সরকার সংরক্ষিত রেখেছে।

সংরক্ষিত ধারাগুলো হলোঃ

- ধারা - ২: নারী-পুরুষের মধ্যে সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত ধারা।
- ধারা - ১৬.১ (গ): বিবাহ- বিচ্ছেদকালে একই অধিকার ও দায়িত্ব সংক্রান্ত ধারা। এবং

সিডও সনদের অপশনাল প্রটোকলের ধারা-১০.১: (অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা বিষয়ক ধারা) যেখানে নিরপেক্ষ তদন্ত ও প্রতিকারের সুপারিশের বিষয় সমুহ অন্তর্নিহিত আছে। এই ধারাসমূহের বিষয়ে এখন পর্যন্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে সিডওর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

লক্ষ্যনীয় যে, ২টি ধারার সংরক্ষণসহ সিডও সনদের স্বীকৃতি মূল সনদের চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। জাতিসংঘের নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডওর গুরুত্বপূর্ণ দুটি ধারা থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করার জন্য আইন কমিশন সরকারকে সুপারিশ পাঠিয়েছে ২০১৩ সালে। এর বিপরীতে সরকার এখন পর্যন্ত এ সুপারিশ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি এবং কমিশনকেও এ বিষয়ে কিছু জানায়নি।

বর্তমানে আইন কমিশনের সদস্য শাহ আলম এ প্রসঙ্গে বলেন, ১৯৯৬ সালের আইন কমিশন অনুযায়ী কোন বিষয়ে কমিশন সুপারিশ দিলে সরকার প্রতিবছর সংসদের প্রথম অধিবেশনে কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করবে। তবে কমিশনের পক্ষ থেকে গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আইন মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠানো হলেও এ দুটি মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

পারিবারিক বিষয়ে সমন্বিত আইন না থাকায় মুসলিম আইন, খ্রিস্টান আইন ও হিন্দু আইন ইত্যাদি ধর্মীয় আইন দ্বারা ওই সব ধর্মের অনুসারীরা তাদের পারিবারিক আইনেই নারীর প্রতি চরম বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ১৬ ধারার প্রতি চরম বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে উৎসাহিত করেছে বলে মনে করা হয়।

সিডও সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও অবস্থা পর্যালোচনামূলক দায়িত্বের অংশ হিসেবে প্রতি ৪ বছর পরপর সিডও কমিটির কাছে প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। পরবর্তী প্রতিবেদন জমা দেয়ার সময় বাংলাদেশ সরকার হয়তো সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তার অবস্থান নতুন করে বিবেচনা করতে পারে এমনটি আশা করছে সিডও নিয়ে কাজ করা সংগঠনসমূহ। সে ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থেই কার্যকর হবে এই সনদ।

সংবিধানে নারী অধিকার

নিম্নে বাংলাদেশের সংবিধানে নারীদের জন্য যে অধিকারগুলোর কথা বলা হয়েছে তা উল্লেখ করা হল-

১. রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করবে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং নারীদেরকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হবে।
২. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে।
৪. সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।
৫. কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।
৬. রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে।
৭. কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।
৮. নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা যাবে।
৯. প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।
১০. কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হবে না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।
১১. আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।

১২. আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হয়ে থাকলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার থাকবে।

১৩. সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন ২০০৪ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করয়া দশ বৎসর অতিবাহিত হবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ৪৫টি আসন কেবল নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং তাহারা সংসদের সাধারণ নির্বাচনে প্রত্যেক দলের সংসদে প্রাপ্ত আসন অনুপাতে প্রত্যেক দল থেকে মনোনীত হবেন। তবে এই দফা মহিলাদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়া থেকে বিরত করবে না।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর নিম্নে উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহে নারীর উন্নয়ন, নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নির্যাতন রোধ এ সম্পর্কীয় অপরাধের বিচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১৬.২ : রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১৬.৪ : নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

১৬.১০ : নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা।

১৬.১১ : নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা।

১৭.২ : নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও)-এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৭.৩ : নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।

১৯.৩ : নির্যাতনের শিকার নারীকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা।

১৯.৭ : নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন ও পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজতর করা।

জাতীয় আইন ও বিধি

- **নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০**

নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ করা হয়েছে।

- **পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০**

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপসনদ, ১৯৭৯ ও শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ এর স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসাবে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ,পারিবারিক সহিংসতা হইতে নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয় পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন,২০১০।

- নাগরিকত্ব আইন (সংশোধিত), ২০০৯

২০০৯ সালে মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের মাধ্যমে মা কর্তৃক সন্তানকে নাগরিকত্ব প্রদানের বিধান সন্নিবেশিত করা হয়।

- ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন, ২০০৯

মেয়েদের উত্যক্ত করা ও যৌন হয়রানী প্রতিরোধে ভ্রাম্যমণ আদালত আইনের তফসিলে দন্ডবিধি আইনের ৫০৯ ধারা সংযুক্ত করার মাধ্যমে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা)বিধি, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নারী ও শিশুর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ, পারিবারিক সহিংসতা হইতে নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয় পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধি, ২০১৩।

- **এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২**

এসিড অপরাধসমূহের কঠোরভাবে দমন করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন। যদি কোন ব্যক্তি এসিড দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব ১ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে (ধারা ৪)

- **এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২**

এসিডের আমদানী, উৎপাদান, পরিবহন, মজুত, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, ক্ষয়কারী দাহ্য পদার্থ হিসেবে এসিডের অপব্যবহার রোধ, এবং এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা, পূনর্বাসন ও আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

- **মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২**

উল্লিখিত আইনটিতেও মানব পাচারের সংজ্ঞা, বিচারিক আদালত ট্রাইব্যুনালের গঠন, তদন্ত, প্রতিরোধমূলক তল্লাশি এবং আটক ও শাস্তির বিষয়গুলো সংযোজিত হয়েছে। উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, প্রথম এই আইনটিতে সাক্ষী সুরক্ষার বিধান রাখা হয়েছে।

- **বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯**

বাল্যবিবাহ নিরোধের লক্ষ্যে এই আইন প্রণীত হয়।

- **যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০**

বিবাহে যৌতুক আদান-প্রদান নিরোধের লক্ষ্যে এই আইন প্রণীত হয়। এই আইন বলবৎ হওয়ার পর, কোন ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে অথবা যৌতুক প্রদান বা গ্রহণে সহায়তা করলে, সে সর্বাধিক পাঁচ বৎসর বা এক বৎসরের নিচে নহে মেয়াদের কারাদন্ড বা জরিমানা অথবা উভয়বিধ প্রকারে দন্ডনীয় হবে(ধারা ৩)

- **শিশুআইন ২০১৩**

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিদ্যমান শিশু আইন রহিতক্রমে এতদ্‌সংক্রান্ত এই নতুন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

- **পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২**

উল্লিখিত আইনটিতে পর্নোগ্রাফির সংজ্ঞা, বিচারিক অদালত, পর্নোগ্রাফি সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ, তদন্ত তল্লাশি ও সাক্ষ্য, শাস্তি, অপরাধের অমলযোগ্যতা, অপরাধের বিচার ও আপিল ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। সেই সাথে পর্নোগ্রাফির উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই আইনে।

- **হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন-২০১২**

স্বাধীনতার ৪২ বছর পর বর্তমান সরকার প্রথমবারের মতো হিন্দু আইনে সামান্য হলেও সংস্কারে হাত দেয়। হিন্দু আইন সংস্কারের আইন কমিশনের সুদীর্ঘ সুপারিশের মধ্য থেকে শুধু বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের আইনটি পাশ হয়। এই আইনের দুর্বল দিক হলো, আইনটি সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়নি। শুধু ঐচ্ছিকভাবে কেউ রেজিস্ট্রেশন করতে চাইলে বিয়েটি রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন। এই আইনটি ২৭ জানুয়ারি ২০১৩-তে কার্যকারিতা পায়।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ধরন

ক. **শারীরিক নির্যাতন:** এমন কোন কাজ বা আচরণ করা, যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির জীবন, স্বাস্থ্য, নিরপত্তা বা শরীরের কোন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হয় অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে অপরাধমূলক কাজ করিতে বাধ্য করা বা প্ররোচনা প্রদান করা বা বলপ্রয়োগও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

খ. **যৌন নির্যাতন:** যৌন প্রকৃতির এমন আচরণও অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্ভ্রম, সম্মান বা সুনামের ক্ষতি হয়। যৌন নির্যাতনের ধরন:

ধর্ষণ: যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত [ষোল বৎসরের] অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া অথবা [ষোল বৎসরের] কম বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

যৌন হয়রানি: যৌন হয়রানির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে–০১. অনাকাংখিত যৌন আবেদনকারী আচরণ (সরাসরি বা আকার ইঙ্গিতে) যা শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন ইঙ্গিত করে। ০২.প্রশাসনিক কর্তৃত্বমূলক বা পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে যৌন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন বা প্রচেষ্টা গ্রহণ। ০৩. যৌন আবেদনময়ী মুখের অভিব্যক্তি। ০৪. যৌন আনুগত্যের অনুরোধ বা আকাঙ্খা। ০৫. পর্ণোগ্রাফী প্রদর্শন। ০৬. যৌন আবেদনময়ী ইঙ্গিত বা অঙ্গভঙ্গি। ০৭. অসৌজন্যমূলক অঙ্গভঙ্গি, হয়রানিমূলক ভাষা ব্যবহার, যৌনতা উদ্দীপক কৌতুক। ০৮.চিঠি, টেলিফোন, কল, মোবাইল ফোন, এসএমএস, পোস্টারিং, নোটিস, কারখানা, শ্রেণিকক্ষ, পায়খানা ইত্যাদিতে এমন লেখা যা যৌন উদ্দীপক কৌতুক। ০৯.ব্লাক মেইল বা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ।১০. খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক, পাঠ্যক্রম সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে যৌন অথবা যৌন হয়রানির নিমিত্ত অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা। ১১. প্রেম প্রস্তাব দেয়া এবং তা প্রত্যাখানের ফলে চাপ দেয়া বা ভয়ভীতি প্রদর্শন। ১২. কৃত্রিম বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা।

গ) **মানসিক নির্যাতন:** মৌখিক নির্যাতন, অপমান, অবজ্ঞা, ভীতি প্রদর্শন বা এমন কোন উক্তি করা, যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি-মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়; হয়রানি অথবা ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অর্থাৎ স্বাভাবিক চলাচল, যোগাযোগ বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মতামত প্রকাশের উপর হস্তক্ষেপ।

ঘ) **দগ্ধ নির্যাতন:** যে কোন দাহ্য পদার্থ যেমন গরম পানি, গরম পদার্থ, চুলার আগুন, সিগারেটের ছ্যাকা, কেরোসিন তেল, কুপির আগুন ইত্যাদি দ্বারা নির্যাতন।

ঙ) **এসিড নির্যাতন:** এসিড অর্থ গাঢ়, তরল অথবা মিশ্রণসহ যে-কোন প্রকার সালফিউরিক এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, ফসফরিক এসিড, কষ্টিক পটাশ, কার্বলিক এসিড, ব্যাটারী ফ্লুইড(এসিড), ক্রোমিক এসিড ও এ্যাকোয়া-রোজিয়া, এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এসিড জাতীয় এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি। এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি অর্থ এসিড নিক্ষেপের ফলে বা অন্য কোনভাবে এসিড দ্বারা শারীরিক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি।

চ) **অর্থনৈতিক নির্যাতন:** অর্থনৈতিক নির্যাতন অর্থে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত হইবে, যথা-আইন বা প্রথা অনুসারে বা কোন আদালত বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যে সকল আর্থিক সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী, সম্পদ বা সম্পত্তি লাভের অধিকারী সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ বা সম্পত্তি লাভের অধিকারী উহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা অথবা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান; সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র প্রদান না করা; বিবাহের সময় প্রাপ্ত উপহার বা স্ত্রীধন বা অন্য কোন দান বা উপহার হিসাবে প্রাপ্ত কোন সম্পদ হইতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা বা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান; অথবা পারিবারিক সম্পর্কের কারণে যে সকল সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধাতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির ব্যবহার বা ভোগ-দখলের অধিকার রহিয়াছে উহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা বা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান।

ছ) **মানবপাচার:** মানবপাচার অর্থ কোন ব্যক্তিকে– ক. ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ করিয়া; বা খ. প্রতারণা করিয়া বা উক্ত ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক বা পরিবেশগত বা অন্য কোন অসহায়ত্বকে কাজে লাগাইয়া: বা গ. অর্থ বা অন্য কোন সুবিধা লেনদেন-পূর্বক উক্ত ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে এমন ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ করিয়া; বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যৌন শোষণ বা নিপীড়ন বা শ্রম শোষণ বা অন্য কোন শোষণ বা নিপীড়নের উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা ক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন বা স্থানান্তর, চালান বা আটক করা বা লুকাইয়া রাখা বা আশ্রয় দেওয়া।

জ) বহুবিবাহ: আইনের শর্তাবলী না মেনে নিজের স্বার্থে স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিত অথবা জোরপূর্বক বহুবিবাহ এবং স্ত্রীগণের প্রতি সমতাসূচক আচরণ না করার মতো নির্যাতন পরিলক্ষিত হয়।

ঝ) বাল্যবিবাহ: শিশু বলিতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহার বয়স পুরুষ হইলে [একুশ বৎসরের] কম এবং নারী হইলে [আঠারো বৎসরের] কম; বাল্যবিবাহ বলিতে সেই বিবাহকে বুঝায় যাহাতে সম্পর্ক স্থাপনকারী পক্ষদ্বয়ের যে কোন একজন শিশু।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণে জাতিসংঘের প্রচারাভিযান

আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ পক্ষ (Sixteen Day Campaign):১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত উইমেন'স গ্লোবাল লিডারশিপ ইন্সটিটিউটের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযান। প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণকারীরা স্থির করে যে ২৫ নভেম্বর তারিখটি হবে নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস এবং ১০ ডিসেম্বর হবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। নারীর প্রতি সহিংসতাকে মানবাধিকারের সাথে সম্পর্কিত করা এবং এ ধরণের সহিংসতা যে মানবাধিকার লঙ্ঘন সেটার উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য প্রতিরোধ পক্ষ পালিত হয়।

নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রচারভিযান (UNITE to End Violence Against Women Campaign):জনগণের মাঝে নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত সচেতনতা বাড়াতে এবং সমগ্র বিশ্বে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে রাজনৈতিক ক্ষেত্র ও সম্পদের বরাদ্দ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘের মহাসচিব ২০০৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি এ প্রচারভিযানের ঘোষণা করেন। এই প্রচারভিযান ২০১৫ সাল পর্যন্ত পরিচালিত হবে।

নারী নির্যাতন বন্ধে একত্রিত হয়ে নির্যাতনকে না বলুন(Say No-UNITE to End Violence Against Women):জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ক্যাম্পেইনসমূহের মাঝে একটি হল Say No-UNITE to End Violence against Women যা নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে একটি সামাজিক সংহতির প্লাটফর্ম। ইউএন উইমেন ২০০৯ সালের নভেম্বরে এই ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করে। এই ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য হল সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যক্তি, সুশীল সমাজ, সরকারের পদক্ষেপসমূহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সমগ্র বিশ্বে প্রচার এবং এ ব্যাপারে কাজ করতে অন্যান্যদের উৎসাহিত করা।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতিসংঘ ট্রাষ্ট ফান্ড (UN Trust Fund to End Violence Against Women):জাতিসংঘ ট্রাষ্ট ফান্ড নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সকল ধরণের সহিংসতা প্রতিরোধে একটি আন্তর্জাতিক তহবিল। ১৯৯৫ সালের ২২শে ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক এই তহবিল গঠিত হয় যা ইউএন উইমেন দ্বারা পরিচালিত এবং বিভিন্ন দেশের সরকার, প্রাইভেট সেক্টর, ব্যক্তির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করে।

নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ভার্চুয়াল নলেজ সেন্টার (Virtual Knowledge Centre to End Violence Against Women and Girls):নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ভার্চুয়াল নলেজ সেন্টার একটি অনলাইন রিসোর্স যা ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, ও স্প্যানিস ভাষায় অনূদিত। নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে নীতি প্রণয়নকারী, প্রোগ্রাম বাস্তবায়নকারী ও অন্যান্য যারা এই বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে তাদের সহায়তা করার জন্যই ২০১০ সালের মার্চ মাসে ইউএন উইমেন এই অনলাইন নলেজ সেন্টার চালু করে।

সংঘাতময় পরিস্থিতিতে যৌন সহিংসতার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের অ্যাকশন (U.N. Action Against Sexual Violence in Conflict): সংঘাতের পূর্বে ও পরে যৌন সহিংসতা প্রতিরোধে জাতিসংঘের কার্যক্রমের মাঝে সমন্বয় ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, আরও অধিকতর কার্যকরী করা এবং যৌন সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন দেশের জাতীয় উদ্যোগকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ২০০৭ সালে জাতিসংঘের ১৩টি সংগঠন একত্রিত হয়ে এই এ্যাকশন গ্রহণ করে।

নারী নির্যাতনের জাতীয় পর্যায়ের চিত্র

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, খেলাধূলা ও প্রশাসনিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন নারীরা। বিগত বছরগুলোর মতো ২০১৫ সালেও নারী উত্যক্তকরণ, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, সালিশ ও ফতোয়ার মাধ্যমে নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যা, এসিড নিক্ষেপ, পারিবারিক নির্যাতন ও গৃহকর্মী নির্যাতনসহ নারী

নির্যাতনের অনেক ঘটনা ঘটে। দেশের নারী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অব্যাহত বিভিন্ন কর্মসূচির কারণে নারী নির্যাতনের অনেক ঘটনার ক্ষেত্রে মামলা হলেও মূলত বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে ভিকারুননেছা নূন স্কুলের ছাত্রী ধর্ষণের মামলার আসামি শিক্ষক পরিমল জয়ধরের যাবজ্জীবন শাস্তির রায় এ বছর প্রদান করা হয়; যা বিচারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হয়েছে। অন্যদিকে তালাকনামায় স্বাক্ষর না করায় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে এক গৃহবধূকে গাছে বেঁধে নির্যাতন, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে মা-মেয়েকে পেট্রোল ছুড়ে পুড়িয়ে হত্যা, বরিশালে গৃহবধূকে ২২ দিন ঘরে আটকে রেখে নির্যাতনের ঘটনা ছিল উল্লেখযোগ্য।

উত্যক্তকরণ, যৌন হয়রানি ও নির্যাতন: ২০১৫ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কর্মস্থলে যৌন নির্যাতন ও বখাটে দ্বারা উত্যক্তকরণের ঘটনা বেড়েছে। ২০১৫ সালে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন মোট ২২৪ জন নারী। এর মধ্যে আত্মহত্যা করেছেন ১০ জন। যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করায় খুন হয়েছেন ৬ জন, বখাটেদের প্রতিবাদ করায় লাঞ্ছিত হয়েছেন ২০৫ জন নারী এবং স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়েছে ৪ জন মেয়ের। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছিলেন মোট ১৪৬ জন নারী। এ বছরের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ছিল পহেলা বৈশাখের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসসি এলাকায় কতিপয় বখাটে কর্তৃক কয়েকজন তরুণীর যৌন হয়রানির শিকার হওয়া। যেখানে পুলিশ উপস্থিত থেকেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল। বর্ষবরণে নারী লাঞ্ছনার বিচার চাইতে এসে উল্টো লাঞ্ছিত হয়েছে ছাত্রীরা। পুলিশের লাথি ঘুষি খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায় কয়েকজন ছাত্রীকে। এছাড়াও ১৮ আগস্ট সিরাজগঞ্জের তাড়াশে মেয়েকে উত্যক্ত করার প্রতিবাদের জন্য বখাটেরা হত্যা করে তার মাকে। অপরদিকে ২৬ আগস্ট মাদারীপুর মেয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বখাটে দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় এক স্কুলছাত্রীকে আত্মহত্যা করেন।

ধর্ষণ: ২০১৫ সালে ৮৪৬ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণ পরবর্তী সময়ে ৬০ জনকে হত্যা করা হয় এবং ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা করেন ২ জন। যেখানে ২০১৪ সালে ৭০৭ জন নারী ও শিশু ধর্ষনের শিকার হন। এর মধ্যে ধর্ষণ পরবর্তী সময়ে ৬৮ জনকে হত্যা করা হয় এবং ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেন ১৩ জন। ৬ জানুয়ারি রাজবাড়ী পাংশায় সরিষা ইউনিয়নের আদিবাসী এক নারী ও তার মেয়ে ধর্ষণের শিকার হন। অন্যদিকে যশোরের কেশবপুরে এক বাকপ্রতিবন্ধী নারী এবং ঢাকায় আদিবাসী গারো তরুণী চলন্ত মাইক্রোবাসে ধর্ষণের শিকার হন। এছাড়া কোনো কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে ধর্ষণের সময় ধারণকৃত ভিডিও চিত্র ইন্টারনেে ছড়ানোর হুমকি দিয়ে চাঁদা দাবি এবং ফেসবুকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে ভিডিও চিত্র প্রকাশের প্রবণতা দেখা গেছে।

সালিশ ও ফতোয়া: বিগত বছরগুলোর তুলনায় ২০১৫ সালে সালিশ ও ফতোয়ার মাধ্যমে নারী নির্যাতনের ঘটনার সংখ্যা কমেছে। আসকের তথ্য সংরক্ষণ ইউনিটের হিসেব মতে ২০১৫ সালে সালিশ ও ফতোয়ার মাধ্যমে মোট ১২ জন নারী নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে থানায় মামলা হয়েছে ৩টি। কিন্তু ২০১৪ সালে সালিশ ও ফতোয়ার মাধ্যমে ৩২ জন নারী নির্যাতনে শিকার হন। ১৫ অক্টোবর বরিশালে সালিশের নামে এক গৃহবধূকে জুতাপেটা করা হয়। সিরাজগঞ্জের তাড়াশে ধর্ষণ মামলা আপোষ না করায় ধর্ষিতার পরিবারকে সমাজচ্যুত করা হয়। রাজশাহীতে সালিশের মাধ্যমে আদিবাসী নারীকে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয় এবং বগুড়ায় হিল্লা বিয়েতে রাজি না হওয়ায় পরিবারকে একঘরে করা হয়েছে।

এসিড নিক্ষেপ, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন ও গৃহকর্মী নির্যাতন: বিগত বছরগুলোর তুলনায় ২০১৫ সালে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা কিছুটা কমে এসেছে। ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে যেখান এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছেন যথাক্রমে ৬৮, ৪৪ ও ৪৮ জন নারী। সেখানে ২০১৫ সালে মোট ৩৫ জন নারী এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে মাত্র ৮টি ঘটনার ক্ষেত্রে মামলা হয়েছে। অপরদিকে ২০১৫ সালে যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন মোট ৩৭৩ জন, যার মধ্যে থানায় মামলা হয়েছে ১৪৬টি। ২০১৫ সালে নারী গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনায় মোট ৬৩ জন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন যার মধ্যে ২২টি ঘটনার মামলা হয়েছে। তবে আশার দিক হচ্ছে এ বছরে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা মন্ত্রিসভায় অনুমোদন হয়, যাতে গৃহকর্মীদের অধিকারের ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ফতোয়া সংক্রান্ত উচ্চ আদালতে রায়

গত ২৫ জানুয়ারি ২০১৫ প্রকাশিত হয় ফতোয়াসংক্রান্ত আপিল বিভাগের রায়ের (দেওয়ানি আপিল ৫৯৩-৫৯৪, ২০০১) পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ নিম্নলিখিত রায় প্রদান করেন:

১. ধর্মীয় বিষয়ে যথাযথ শিক্ষিত ব্যক্তিরা শুধু ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে ফতোয়া দিতে পারবেন। এই ফতোয়া স্বেচ্ছায় গৃহীত হতে হবে। ফতোয়া মানতে কাউকে বাধ্য করা, জোর করা কিংবা অনুচিত প্রভাব প্রয়োগ করা যাবে না।
২. কোনো ব্যক্তির দেশে প্রচলিত আইন দ্বারা স্বীকৃত অধিকার, সম্মান বা মর্যাদা ক্ষুণ্ন বা প্রভাবিত করে, এমন ফতোয়া কেউ প্রদান করতে পারবে না।
৩. ফতোয়ার নামে কোনো প্রকার শাস্তি শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না।
৪. তবে ওই নির্দিষ্ট ফতোয়াটি (যা হাইকোর্ট অবৈধ বলেছেন) অবৈধ ও আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করা হলো।

উচ্চ আদালতের এই রায়ের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে, এটি ফতোয়ার অপব্যবহারকে নিষিদ্ধ করেছে, ফতোয়াকে সরাসরি নিষিদ্ধ করেনি।

নারী ও শিশু নিযাতন দমন আইন প্রসঙ্গে সর্বোচ্চ আদালতের রায়: ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় মৃত্যুদ- ছাড়া অন্য কোনো শাস্তির বিধান না থাকা, বিচার বিভাগের বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা এবং সংবিধানের আইনগত অধিকারের পরিপন্থি হবার কারণে গত ৫ মে ২০১৫ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ, ১৯৯৫-এর নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইনটির ধারা ৬(২), ৬(৩), ৬(৪) অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করেন। পাশাপাশি আদালত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ৩৪(২) ধারাকেও অবৈধ বলে ঘোষণা করেন, যেহেতু এই ধারাবলে '৯৫-এর রহিত করা আইনটি ২০০০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারির আগে দায়ের করা মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। ২০০৫ সালে হাইকোর্টে দায়ের করা এক রিট পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে (রিট পিটিশন নং ৮২৮৩/২০০৫) প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের চার সদস্যের একটি বেঞ্চে এই রায় প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে গত ৩ আগস্ট ২০১৫ তারিখে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ অত্র মামলার আসামি শিশু অপরাধী শুকুর আলীর মৃত্যুদ-ের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদ-ের আদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ– এই রায়ের মাধ্যমে একদিকে যেমন নারী ও শিশু নির্যাতন (দমন) আইনের অসাংবিধানিক ও কর্তৃত্বপূর্ণ ধারাগুলিকে বাতিল করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশে শিশু অপরাধীর সাজা হিসেবে মৃত্যুদ-কে বাতিল করা হয়েছে।

ধর্ষণ ও হাইকোর্টের রুল: রাজধানীতে এক গারো তরুণীকে গণধর্ষণের ঘটনায় নারীপক্ষ, মহিলা পরিষদ, জাতীয় অদিবাসী পরিষদ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং ব্লাস্ট গত ২৪ মে একটি রিট আবেদন (রিট পিটিশন নং ৫৫৪১/২০১৫) করলে প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও কাজী মো. ইজারুল হক আকন্দের বেঞ্চ ২৫ মে তিনটি রুল জারি করেন। প্রথম রুলে, মামলা গ্রহণে অবহেলা, ভিকটিমকে সাপোর্ট সেন্টারে পাঠানো এবং ডাক্তারি পরীক্ষায় বিলম্ব কেন অসাংবিধানিক এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের লঙ্ঘন হবে না– তা জানতে চাওয়া হয়েছে; দ্বিতীয় রুলে, ধর্ষণের শিকার তরুণীকে এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না– তা জানতে চান আদালত; এবং তৃতীয় রুলে অদালত জানতে চেয়েছেন, মামলা নিতে বিলম্বের জন্য দায়ী পুলিশের বিরুদ্ধে কেন শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ব্যবস্থা নেয়া হবে না। একই সঙ্গে আদালত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপরোক্ত রুলের জবাব দেওয়ার জন্য ও মামলা গ্রহণের অবহেলার জন্য দায়ী পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা জানতে চেয়ে স্বরাষ্টসচিব, আইজিপি ও ঢাকার পুলিশ কমিশনারসহ সংশ্লিষ্ট থানার ওসি ও থানার ডিউটি অফিসারকে নির্দেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি থানায় ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ ও জন্মপরিচয়-নির্বিশেষে বৈষম্যহীনভাবে সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বরাষ্টসচিব, আইজিপি ও ঢাকার পুলিশ কমিশনারকে একটি সার্কুলার জারির নির্দেশ দেন। এই আদেশ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব অবহেলায় অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে এবং আদালত-নির্দেশিত সার্কুলারও জারি করে। যৌন হয়রানি ও সহিংসতা বন্ধে বিদ্যমান আইন ও আইনি প্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনা করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, আইনজীবী ও নারী অধিকার কর্মীদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি করতে

রিটকারীদের কাছে নামের তালিকা চেয়েছিলেন হাইকোর্ট ডিভিশন, যা ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫ সালে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত এই সকল আদেশ ও রায়ের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সামাজিকভাবে এই সকল অপরাধ প্রতিরোধের দিকনির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে।

গাইবান্ধা জেলায় নারী নির্যাতনের চিত্র

২০১৫ সালে নারীর প্রতি সহিংসতার বিভিন্ন ধরণ দেখা যায় গাইবান্ধা জেলায়। নানা ধরণের সহিংসতার পাশাপাশি ধর্ষণ, গণধর্ষণ, উত্ত্যক্তকরণের মতো জঘন্য অপরাধের মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলায় নারী নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সারা বছর। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা আইন, নীতি এবং সনদ থাকলেও নারীর প্রতি সহিংসতা সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দূর হচ্ছেনা বরং নারীর প্রতি সহিংসতার নিত্য নতুন ধরণ দেখা যাচ্ছে। পারিবারিক কলহের আড়ালে নারীর প্রতি সহিংসতা আড়াল হওয়া, সহিংসতার কারণগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত না করা, যথাসময়ে প্রতিরোধের ব্যবস্থা না নেয়া, দিনের পর দিন বিচার না পাওয়া, বিচারের নামে দীর্ঘসূত্রিতা, সঠিক আইন না থাকা, মাদকাসক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া, বেকারত্ব, তথ্য প্রযুক্তির বিস্তার ইত্যাদি বিষয় নারীর প্রতি সহিংসতা সমাজে,রাষ্ট্রে টিকে থাকার অন্যতম কারণ।

রাষ্ট্র এবং সমাজের নারীকে এগিয়ে নিতে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নানা উদ্যোগ সারাদেশ ব্যাপী দীর্ঘদিন যাবত চলছে। এই সমস্ত উদ্যোগের ফলে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের গাইবান্ধাজেলাতে সেই সামগ্রিক উদ্যোগ এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

যৌতুককে কেন্দ্র করে নির্যাতন

৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে 'দৈনিক আজকের জনগণ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'যৌতুক না দেয়ার গৃহবধুকে পিটিয়ে হত্যা' শীর্ষক সংবাদ শিরোনামের ঘটনাটি ছিল এমন–

যৌতুকের দাবি মেটাতে ব্যর্থ হওয়ায় সাদুল্যাপুর উপজেলার গোলাপী রানী (৩০) নামে এক গৃহবধূকে পিটিয়ে হত্যা করেছে স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজন। জানা গেছে, উপজেলার ইদিলপুর ইউনিয়নের মহিপুর গ্রাম থেকে সোমবার রাত সাড়ে ১০টায় পুলিশ এই গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে। বিয়ের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে যৌতুকের দাবিতে গোলাপীর উপর নির্যাতন চালাতো স্বামী ও তার পরিবারের লোকজন। স্বামী অতুল কুমার যৌতুক দাবি করে গোলাপীকে তার বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসতে বলে। এতে গোলাপী রাজি না হলে স্বামী অতুল কুমার ও তার পরিবারের লোকজন গোলাপীকে বেদম মারধর করলে সে নিহত হয়। বিষয়টি জানাজানি হলে গোলাপীর বাবার বাড়ির লোকজন এসে বিষয়টি পুলিশকে জানালে রাতেই গোলাপীর লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। সাদুল্যাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়া লতিফুল ইসলাম জানান, এ ঘটনার গোলাপীর বড় ভাই রতন সরকার বাদি হয়ে সাদল্যাপুর থানায় মঙ্গলবার সকালে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনার পর থেকে স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজন পলাতক থাকায় কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

২৬ জুলাই ২০১৫ তারিখে 'দৈনিক আজকের জনগণ' পত্রিকার প্রকাশিত 'যৌতুকের টাকা না পেয়ে গোবিন্দগঞ্জে স্ত্রীকে গলাকেটে হত্যার চেষ্টা' শীর্ষক সংবাদ শিরোনামের ঘটনাটি ছিল এমন–

গোবিন্দগঞ্জে যৌতুকের টাকা না পেয়ে বুলি খাতুন নামের এক গৃহবধূকে দা দিয়ে গলা কেটে হত্যার চেষ্টা করেছে পাষণ্ড স্বামী ও তার পরিবারের সদস্যারা। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই গৃহবধূ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা দায়ের হলেও পুলিশ স্বামী জাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করতে পারেনি। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বুলি বেগম জানায়, ৪ বছর পূর্বে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার শিবপুর গ্রামের আবুল হোসেনের পুত্র করাত কল মিস্ত্রী জাহিদুলের সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ের স্বামীর সাথে গোবিন্দগঞ্জ শহরের শিল্পপাড়ার একটি ভাড়ার বাসায় থাকত। ঈদের আগের দিন স্বামী জাহিদুল তার কাছে যৌতুকের ১০ হাজার টাকা দাবি করে। টাকা দিতে না পারায় জাহিদুল তাকে মারপিট করে ওই বাসায় রেখে গ্রামের বাড়ি চলে যায়। এরপর বুধবার সকাল ১১টার দিকে জাহিদুল মোবাইল ফোনে বুলিকে তার গ্রামের বাড়িতে ডেকে এনে স্বামী জাহিদুল ও তার

পরিবারের সদস্যরা বুলিকে বেধড়ক মারপিটের একপর্যায়ে দা দিয়ে গলা কেটে হত্যার চেষ্টা করে। বুলির আর্তচিৎকারে স্থানীয় লোকজন এসে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে গোবিন্দগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করায়।

এক নজরে গাইবান্ধা জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির ২০১৫ সালে মাসিক সভার প্রতিবেদন অনুযায়ী নারী নির্যাতনের চিত্রঃ

ইস্যু	মাসের নাম	নারী নির্যাতনের সংখ্যা ২০১৪	নারী নির্যাতনের সংখ্যা ২০১৫	আধিক্য (+-)
নারী নির্যাতন	জানুয়ারি	১০	২০	১০ (+)
	ফেব্রুয়ারি	১০	১২	০২ (+)
	মার্চ	১৫	১৫	০০ (=)
	এপ্রিল	২৪	১২	১২ (-)
	মে	২৭	৩৩	০৬ (+)
	জুন	২৫	২৬	০১ (+)
	জুলাই	২৭	২৩	০৪ (-)
	আগস্ট	৩২	২৯	০৩ (-)
	সেপ্টেম্বর	২৯	২৩	০৬ (-)
	অক্টোবর	১৭	২২	০৫ (+)
	নভেম্বর	২১	২৯	০৮ (+)
	মোট=	২৩৭	২৪৪	০৭ (+)

ধর্ষণ

নারীর উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন হচ্ছে ধর্ষণ। গাইবান্ধা জেলায় অসংখ্য ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ধর্ষণের ঘটনা সামাজিকভাবে নিষ্পত্তির সুযোগ নাই। ভিকটিম পরিবারও এসব স্পর্শকাতর ঘটনা গোপন রাখতে আগ্রহী। তাই ধর্ষণের প্রকৃত হিসাব থানায় রেকর্ড করা যাচ্ছে না। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে 'দৈনিক জনসংকেত' পত্রিকার প্রকাশিত 'গোবিন্দগঞ্জে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা' শীর্ষক সংবাদ শিরোনামের ঘটনাটি ছিল এমন–

গোবিন্দগঞ্জে মনিকা খাতুন (১৭) নামে এক মেধাবী স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের পর মুখে বিষ দিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। সে উপজেলার তালুককানুপুর ইউনিয়নের চন্ডিপুর গ্রামের মোতাকাবের মেয়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার তালতোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণিতে পড়তো মনিকা খাতুন। লেখাপড়ার এক পর্যায়ে রুবেল (১৮) নামের এক সহপাঠির সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সে ওই গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে। গোবিন্দগঞ্জ থানার উপ-পুলিশ পরিদর্শক (এসআই) ইসমাইল হোসেন স্থানীয়দের বরাত দিয়ে জানান, মোতাকাব্বের বুধবার রাতে মনিকা ও মিলিসহ ৩ মেয়েকে বাড়িতে রেখে স্ত্রীকে নিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে যান। এই সুযোগে রুবেল ৪/৫ জন বন্ধু নিয়ে গভীর রাতে ওই বাড়িতে গিয়ে মনিকাকে ডাক দেন। মনিকা ঘরের দরজা খুলে দেয়া মাত্রই রুবেল ঘরে ঢুকে ৩ বোনকে অচেতন করার পর মনিকাকে পার্শ্ববর্তী সুফিয়া বেগমের বাড়িতে নিকট ফাঁকা জায়গায় এনে ধর্ষণ করেন। এ ঘটনার পর তার মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে রুবেল ও তার সহযোগীরা সটকে পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজন বিষয়টি টের পেয়ে মনিকাকে উদ্ধার করে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা সাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে দেন। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, মনিকার শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটলে তাকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার ভোরে তার মৃত্যু ঘটে। গোবিন্দগঞ্জ থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এবিএম জাহিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

এক নজরে গাইবান্ধা জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির ২০১৫ সালে মাসিক সভার প্রতিবেদন অনুযায়ী ধর্ষণের চিত্র:

ইস্যু	মাসের নাম	ধর্ষণের সংখ্যা ২০১৪	ধর্ষণের সংখ্যা ২০১৫	আধিক্য (+-)
ধর্ষণ	জানুয়ারি	০২	০১	০১ (-)
	ফেব্রুয়ারি	০৩	০৮	০৫ (+)
	মার্চ	০৯	০৬	০৩ (-)
	এপ্রিল	২৪	০৪	২০ (-)
	মে	১৪	০৮	০৬ (-)
	জুন	০৭	০৮	০১ (+)
	জুলাই	০৫	১৪	০৯ (+)
	আগস্ট	১০	১৩	০৩ (+)
	সেপ্টেম্বর	১০	০৭	০৩ (-)
	অক্টোবর	০৬	০৭	০১ (+)
	নভেম্বর	০৪	০৩	০১ (-)
	মোট	৯৪	৭৯	১৫ (-)

আত্মহত্যা

গাইবান্ধা জেলায় নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। পত্রিকায় সারাবছর ১২ জন নারী আত্মহত্যার ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। নারীদের আত্মহত্যার পিছনে পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা দায়ী। পরিবার ও সামাজিক কারণে নারীরা নানাভাবে নির্যাতিত হয়। নির্যাতিত নারীরা পারিবারিক, সামাজিক নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

ইস্যু	ধরণ অনুযায়ী সংখ্যা	উপজেলা অনুযায়ী সংখ্যা	মোট সংখ্যা
আত্মহত্যা	বিষপানে আত্মহত্যা-০৪ ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা-০৮	সুন্দরগঞ্জ-০৭ গোবিন্দগঞ্জ-০৫	১২

প্রশাসনের পদক্ষেপ

গাইবান্ধা জেলার নারী নির্যাতনের প্রচুর ঘটনা যেমন সংঘটিত হয়েছে তেমনি এ ধরনের বিষয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আসামীকে কারাদ- দেয়ার ঘটনাও দেখা গেছে। যেমন গত ১৬ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে 'দৈনিক মাধুকর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্কুল ছাত্রীকে যৌন হয়রানির দায়ে এক যুবকের কারাদ-' শীর্ষক সংবাদ শিরোনামের ঘটনাটি ছিল এমন–

গাইবান্ধা সদর উপজেলার ভি-এইড রোড কালিবাড়ি এলাকার নবম শ্রেণির এক স্কুল ছাত্রীকে যৌন হয়রানি করার দায়ে ওই এলাকার বখাটে যুবক নয়ন কুমারকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদ-দেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত। দ-প্রাপ্ত নয়ন কালিবাড়ি পাড়ার মৃত উত্তম কুমারের ছেলে। গাইবান্ধা সদর উপজেলা মডেল স্কুল এন্ড কলেজের নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে নয়ন কুমার তার স্কুল ব্যাগ ধরে টানা হেচড়া করে এবং আপত্তিকর ভাষা প্রয়োগ করে। এলাকাবাসী ও মেয়ের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বখাটে যুবক নয়ন দীর্ঘদিন থেকে ওই ছাত্রীকে উত্যক্ত করে আসছিল। একাধিকবার তাকে নিষেধ করার পরও সে নানাভাবে মেয়েটি ও তার পরিবারকে হুমকি দিচ্ছিল। স্কুল ছুটির পর মেয়েটি বাড়ি ফেরার সময় কালিবাড়ি পাড়ায় নয়ন তার পথরোধ করে দাঁড়ায় এবং মেয়েটিকে আপত্তিকর ভাষায় কথা বলতে থাকে। এ সময় মেয়েটি প্রতিবাদ করে উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠলে এলাকার লোকজন ছুটে এসে বখাটে নয়নকে আটক করে এবং পুলিশকে খবর দিয়ে তাদের হাতে তাকে তুলে দেয়।

পরে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশরাফুল মমিন খানের আদালতে তাকে হাজির করা হলে নয়নকে ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড-র আদেশ দেন ।

এক নজরে গাইবান্ধা জেলায় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা/সীমাবদ্ধতা

১. স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে আইন, অধিকার ও প্রতিকার পাওয়ার বিষয়ে অসচেতনতা ।

২. গ্রাম্য সালিশকারদের প্রচলিত আইন ও আদর্শ সম্পর্কে অসচেতনতা ।

৩. গতানুগতিক পদ্ধতিতে সালিশীর আয়োজন ও পেশীশক্তির ব্যবহার ।

৪. পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামী ।

৫. অযাচিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ।

৬. নির্যাতনের শিকার নারী ও চিকিৎসা ও চিকিৎসক প্রতিবেদন প্রদানে অনিয়ম ও দুর্নীতি ।

৭. নির্যাতনের শিকার নারী তথা সাধারণ জনগণের সাথে পুলিশ প্রশাসনের দূরত্ব ।

৮. অসম বিবাহ সম্পাদন (বয়স, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত যোগ্যতা সম্পন্ন পরিবারের ছেলে ও মেয়ের মধ্যে)

৯. বাল্যবিবাহ ।

১০. স্থানীয় পর্যায়ে কাজীগন কর্তৃক পারিবারিক আইনের অপব্যবহার/অপপ্রয়োগ ।

১১. মামলার বিচার নিস্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা ও বিচারপ্রার্থীরা ক্রমাগত হয়রানীর সম্মুখীন হয় ।

১২. দায়িত্ব পালনে হাসপাতাল, থানা, কোর্ট অফিসিয়ালদের দীর্ঘসূত্রিতা/ক্ষেত্রবিশেষ অসহযোগিতা ।

১৩. মামলার কাগজপত্র উত্তোলন/তথ্য আদান প্রদানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর প্রায়শঃ দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া ।

১৪. কতিপয় মহল কর্তৃক মামলার বাদী ও সাক্ষীদের ভয়-ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন ।

১৫. রাজনৈতিক দলগুলোর নারী নির্যাতন সংক্রান্ত বিশেষ কোন উদ্যোগ বা কর্মসূচী না থাকা ।

১৬. আইনগত জটিলতা/সীমাবদ্ধতা ।

১৭. জমি সংক্রান্ত বিরোধ, পারিবারিক বিরোধ, গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা জের ধরে নারী নির্যাতন দমন আইনের অপব্যবহার/অপপ্রয়োগ ।

১৮. আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবের কারণে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আমাদের করণীয়

- যৌন হয়রানিসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা বন্ধে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের রাজনীতিবিদদের সম্পৃক্ত করে একটি রাজনৈতিক কমিটমেন্ট তৈরী করা ।
- স্কুল ও কলেজগামী ছাত্রীদেরকে যৌন হয়রানী বন্ধে সকল ছাত্রী হোস্টেল, মেস, স্কুলের সামনে রাস্তায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের কার্যকর গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা ।
- হাটবাজার বাসস্ট্যান্ড ও রাস্তাঘাটে নারীদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকরণ ও যৌন হয়রানি বন্ধে প্রশাসনের নিজস্ব উদ্যোগের পাশাপাশি স্থানীয় উদ্যোগ উৎসাহিত ও সংগঠিত করা ।
- প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় নারীর প্রতি সহিংসতার কার্যক্রমকে নিয়মিতভাবে প্রচার করা ।
- প্রত্যেক থানায় নির্যাতনের শিকার নারীদের মামলা দায়ের কার্যক্রম সহজ ও দ্রুততর করতে মডেল থানার আদলে পৃথক ইউনিট খোলার জন্য নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করা ।
- কারো দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নারী নির্যাতনের মামলার পুলিশী তদন্ত রিপোর্ট প্রদানের বিষয়কে ত্বরান্বিত করা ।

- নির্যাতনের শিকার নারীদের মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সর্বদা আন্তরিক ও সহযোগিতামূলক আচরণ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা করা।
- বিদ্যমান কোন পক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মেডিকেল রিপোর্ট প্রদান ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে মেডিকেল রিপোর্ট প্রদানে কালক্ষেপন বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- দ্রুততম সময়ের মধ্যে জেলার সকল থানায় নারী নির্যাতনের ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য জেলা পর্যায় থেকে বিশেষ মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে জেলা প্রশাসনকে উদ্যোগী ও উৎসাহিত করা।
- ধর্ষন পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করার ব্যবস্থা করতে সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এডভোকেসি করা।
- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কর্মরত সকল সংগঠনের প্রতিনিধি, মিডিয়া, সিভিল সোসাইটি এবং প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় সভা করা।
- চেঞ্জ মেকার, অপিনিয়ন লিডার ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের জন্য জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক স্থাপন করা।
- প্রশাসন, সিভিল সোসাইটি ও পেশাজীবীদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় সভা, কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিশোরী মেয়েদের সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা অব্যাহত রাখা।

সরকারের প্রতি দাবি

১. অনতিবিলম্বে সিডও সনদের উপর আরোপিত সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে পূর্ণ অনুমোদন চাই।
২. সিডও সনদের যথাযথ বাস্তবায়নে জাতীয়ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।
৩. জাতিসংঘ সিডও কমিটি কর্তৃক দেয়া সুপারিশ এবং বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে সকল পর্যায়ে কর্মকর্তাদের অবহিত করতে হবে এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
৪. বৈষম্যমূলক সকল আইন ও আইনের দ্বারা সংশোধন কিংবা বাতিল করতে হবে, প্রয়োজনে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। যেমন: বিয়ে ও বিয়ে বিচ্ছেদ, সন্তানের উত্তরাধিকার, সম্পদে নারীর অধিকার, নাগরিকত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আইনের বৈষম্যগুলো দূর করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে।
৫. নারীর প্রতি সব ধরনের নেতিবাচক ও গৎবাঁধা ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে সরকারি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যমকে যুক্ত করার জন্য সরকারের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৬. নারীর প্রতি সহিংসতা, পাচার ও যৌন শোষণ ইত্যাদি বন্ধ করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্মিলিত উদ্যোগ নেয়ার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ভূমিকা নিতে হবে।
৭. নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহকে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নিতে হবে।
৮. প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, আদিবাসী, গ্রামীণ, সংখ্যালঘুসহ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অবস্থা উন্নয়নে বিশেষ পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৯. অভিবাসী নারী শ্রমিকদের অধিকার এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হলে নারীকে দেশের সব কর্মকান্ডে নিয়ে আসতে হবে। দরকার নারীর ১০০ ভাগ শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া। দরকার তাদের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তোলা। দরকার তাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়া। শুধু আইন নারীকে রক্ষা করতে পারে না। পাশাপাশি নারীরা সচেতনতা, আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হলে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। সমাজ থেকে কমে যাবে নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ। নারীরা কখনো হবে না অবহেলিত।

নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার প্রশ্নটি মানুষের সার্বিক মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এর জন্য অবশ্যই রাষ্ট্রকে যথাযথ দায়িত্ব নিয়ে নারী নীতিমালা ও নারীর স্বার্থ রক্ষাকারী আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। পরিবার ও সমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা ও অভ্যাসের পরিবর্তন আনার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে হবে। সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নির্দেশনার সনদ, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা মেনে চলার সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। নারী বিদ্বেষী রাজনীতি ও শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে তার প্রসার ও প্রচার বন্ধ করতে হবে এবং এর জন্য কাঠামোগত যে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন অবিলম্বে তার উদ্যোগ নিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা রাষ্ট্র অথবা রাজনীতিতে এ বিষয়ে চাই অঙ্গীকার পূরণে সদিচ্ছার প্রতিফলন। মৌলবাদ, জঙ্গী, প্রতিক্রিয়াশীল অথবা রক্ষণশীল, সামরিকতন্ত্রী প্রভাবের বলয়ের মধ্যে বাস করে নারীর স্বাধীনতা ও সমাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

গাইবান্ধা জেলার দলিত জনগোষ্ঠীর অবস্থান ও অবস্থা

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের আগে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন শহরের বর্জ্য-আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে দলিত সম্প্রদায়ের লোকজনকে নানা সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে এ দেশে নিয়ে আসে। সেই থেকে দলিত সম্প্রদায়ের লোকজন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজটি বংশপরম্পরায় করে আসছে। অন্তহীন শ্রম দেয়া দলিত সম্প্রদায়ের লোকজন স্থান বিশেষে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তথা উচ্চবর্ণ ও শ্রেণীর মানুষের কাছে অস্পৃশ্য, অচ্ছুত, মেথর, সুইপার, হরিজন বা দলিত নামে পরিচিত। বাংলাদেশে বসবাসকারী এ জনগোষ্ঠীর পরিচিতি নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। এমনকি দলিতদের কেউ কেউ নিজেদেরকে দলিত হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেও তাদের অনেকেই আবার নিজেদেরকে দলিত না বলে হরিজন পরিচয়ে পরিচিত হতে পছন্দ করে। অনেকের মতে হরিজন বলতে মোট আটটি গোত্রের মানুষকে বোঝানো হয়। বর্ণের ধারাবাহিকতা অনুসারে এরা প্রাচীন ভারতের শ্রম বিভাজনের ইতিহাস অনুযায়ী শূদ্র বর্ণের অন্তর্গত। এমনিতেই আভিধানিক অর্থে দলিত বলতে মর্দিত বা পিষ্ঠ ইত্যাদি নেতিবাচক শব্দগুলোকে বুঝায়। ব্যাপক অর্থে দলিত শব্দটির ঐতিহ্যগত অর্থ হলো শোচনীয় অবস্থায় পতিত, দারিদ্র জর্জরিত কিংবা অপমান ও অবমাননার শিকার মানুষ। দলিত শব্দটি ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের মারাঠি ভাষা থেকে এসেছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো প্রকৃতপক্ষেই দলিত জনগোষ্ঠী ধর্মের নামে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শোষিত জনগোষ্ঠী। কারো কারো মতে ড. ভিমরাও আম্বেদকার দলিত শব্দটির জনক। হরিজন শব্দটির অর্থ হরির জন বা ঈশ্বরের সন্তান। এদেরকে হরিজন নাম দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী এই উদ্দেশ্যে যে, ভারতবর্ষের অপরিবর্তনীয় হিন্দু সমাজের কাছে অস্পৃশ্য হিসেবে পরিগণিত এই সব মানুষরা যেন সামাজিকভাবে একটা ন্যূনতম সম্মানজনক অবস্থান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

১৫ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের ১ কোটিই দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষ। মানুষ হলেও মানুষ হিসেবে সমাজ কার্যত তাদের স্বীকৃতি দেয়নি। স্বভাবতই প্রতিদিন তার মানবাধিকার লজ্ঘিত হচ্ছে। অন্যদিকে রাষ্ট্র এবং সংবিধান কাগুজে প্রতিরক্ষা দিলেও প্রতিদিন তাদের মানবাধিকার হরণের ঘটনাগুলোর বিপক্ষে আন্তরিক পদক্ষেপ খুব কমই নিয়েছে। আর এইরকম একটি বৈষম্যবান্ধব সমাজ-রাষ্ট্রিক নিরাপদ কাঠামোর ভেতর দিয়েই চলছে বাংলাদেশে দলিতদের জীবনযাত্রা। কেবলমাত্র পেশাগত কারণেই দলিত জনগোষ্ঠী সামাজিকভাবে নিগৃহীত, মর্যাদাহীন এবং অস্পৃশ্য। আবার দারিদ্র্যপীড়িত বলেই কিন্তু দলিতরা অস্পৃশ্য নয়, বরং অস্পৃশ্য বলেই দারিদ্র্যে নিপতিত। এই অস্পৃশ্যতার মূলভূমি হলো তাদের ধর্ম এবং রাজনীতি, যা মানুষ হিসেবে দলিতদের বেঁচে থাকার গন্ডীকে সীমাবদ্ধ করেছে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা, ঘৃণা, পেশাচ্যুতি, ভূমিদখল, অবহেলা, নিরাপত্তাহীনতা, নির্ভরতা, শবদেহ দাহে বাধাপ্রদান, রাষ্ট্রীয় পরিসেবা না পাওয়া ইত্যাদি নানাবিধ অপ্রাপ্তি এই বিশাল সংখ্যক 'দলিতদের' মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার স্বপ্নকে এই বিংশশতাব্দীতেও দলিত করে চলেছে।দেশের সংবিধানের ১১ ধারায় বলা হয়েছে- যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে। কিন্তু দলিত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ নেই।

এক নজরে দলিত মানবাধিকার

একসময়ে দলিতদের বেদ পাঠ বা শ্রবণের অধিকারও ছিল না। যার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে দলিতরা সবচেয়ে পিছিয়ে আছে। সামাজিক অনুষ্ঠানে দলিতদের জন্য আলাদা খাবার ব্যবস্থা করা হয়। মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই। হোটেলে ঢুকতে দেওয়া হয়না, দিলেও নিম্নমানের প্লেটে চিহ্ন দিয়ে নির্ধারিত করা থাকে, কিম্বা কাপ প্লেট সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। সমাজে পাঁচজনের মাঝে বসবাসের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে আমরা তাদের জন্যে মুচিপাড়া, ঋষিপাড়া, রবিদাসপাড়া, মেথরপট্টি, সুইপারকলোনি, কলুপাড়া নামক খোঁয়াড়ের বৃত্তে বন্দী করে রেখেছি। দলিত শিশুদের সাথে অদলিত শিশুরা মিশে না, খেলে না, স্কুলে পাশাপাশি বসে পড়তে চায়না। কোথাও বা 'সবার ওপরে মানুষ সত্য' শেখানোর শিক্ষাগুরু হরিজন শিশুদের স্কুলে পড়তে দেয়ার সুবাদে সপ্তাহে দু'একদিন বাথরুম পরিষ্কার করিয়ে নিচ্ছেন! আমাদের স্বাস্থ্যসেবা কিম্বা স্বাস্থ্যকর্মীরা হরিজন কলোনির গলিঘিঞ্জি মাড়িয়ে মৃত্যুমুখী-বৃদ্ধ, সন্তানসম্ভবা-মা, কিংবা অসুস্থ শিশুকে সেবা দিতে

স্বভাবতই উৎসাহ পান না। আর এইসকল ঘিঞ্জিগলি এবং এর অসহায় বাসিন্দাদের প্রায় সবসময়ই আমাদের জাতীয় উন্নয়ন, ভাবনা, কিম্বা নীতিমালার বাইরে রেখে আমরা বলতে চেয়েছি 'অচ্ছুৎরা' সবসময়ই 'অচ্ছুৎ'!

গাইবান্ধা জেলার দলিত সম্প্রদায়

গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলায় বাসফোড়, নুনিয়া, ডোম, হেলা, রবিদাস, পাটনীসহ দলিত সম্প্রদায়ের ১০ হাজারের অধিক জনগোষ্ঠির বাস। গাইান্ধার জেলার এই দলিত জনগোষ্ঠি জন্ম ও পেশার কারণে নানা রকম বৈষম্য, বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার। গাইবান্ধা জেলার দলিত জনগোষ্ঠির মানুষেরা সকল স্থানে সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম বৈষম্য বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। গাইবান্ধাসহ সকল উপজেলায় ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জন্ম ও পেশার কারণে অস্পৃশ্যতা ও অবজ্ঞা ব্যাপক ভাবে বিদ্যমান। যেন স্বাধীন একটি দেশের মাঝে আর একটি দেশ, ভিন্ন একটি আইন শুধু দলিত সম্প্রদায়ের জন্য জারি আছে। দলিত সম্প্রদায়ের মানুষগুলো হোটেল রেষ্টুরেন্টে প্রবেশের অধিকার পায় না। তাদের খাবার খেতে হয় খবরের কাগজে রাস্তা ও রেললাইনের পাশে কুকুর বা ময়লা আবর্জনার পাশে বসে। দলিত সম্প্রদায়ের কেউ এর প্রতিবাদ করলে অপমান মারধর ও চরম নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

হরিজনরা মোট ৮টি গোত্রে বিভক্ত। তার মধ্যে হেলা, ডোমার, লালবেগী, বালমেকী, বাশফোঁড়, হাড়ী, রাউৎ। অনগ্রসর দলিতদের একটি অংশ এই হরিজন শুধুমাত্র পেশা অবলম্বনের জন্য সামাজিকভাবে অবহেলিত ও বঞ্চিত। বাংলাদেশের দলিত হরিজনরা এখনো সমাজের মূলস্রোতের সঙ্গে মিশতে পারেনি। আদিবাসীদের নিয়ে রাষ্ট্র চিন্তা করলেও হরিজন বা দলিতদের নিয়ে রয়েছে উদাসীনতা। শুধুমাত্র কিছু উন্নয়ন বরাদ্দ থাকলেও তা আসলে হরিজনদের জীবনমান উন্নয়নে কোন পরিবর্তন আনতে পারছে না। রাষ্ট্র তাদের নিয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করেনি। এ ছাড়াও রাষ্ট্রের কাছে হরিজন বা দলিত সম্প্রদায়ের সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। প্রতিদিন হরিজনরা রাতের নোংরা জনপদ ভোরের সূর্য উঠার আগেই পরিষ্কার করে যাতে সকালবেলা প্রত্যেক নাগরিক সুন্দর পরিষ্কার রাস্তায় চলাচল করতে পারে।

গাইবান্ধা পৌরসভায় যারা কাজ করে তাদের বেতন-ভাতা মাসিক বেতন মাত্র ৮০০ টাকা ছিল। পরবর্তীতে গাইবান্ধা মেয়র মো. শামসুল আলম বাড়িয়ে ১২০০ টাকা করেন। প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য যা দিয়ে পরিবার পরিচালনা করতে হিমশিম খেতে হয়। তাছাড়াও গ্রামগঞ্জে যারা কাজ করেন তারা আরো কম টাকা পান। পরিবারের সবাই মিলে কাজ করেও পরিবার চালানো কঠিন।

শুধুমাত্র হরিজন বলেই বণ বৈষম্যের শিকার হয়। গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার মীরগঞ্জ নিবাসী উজ্জর ডোম ও দয়াল ডোম সুন্দরগঞ্জ তার বন্ধুদের সাথে বেড়াতে গিয়েছিল। বেড়ানোর এক পর্যায়ে সকল বন্ধুরা মিলে একটি খাবার হোটেলে খাবার খেতে বসে। দোকানের কর্মচারী সবাইকে খাবার প্লেটে করে পরিবেশন করলেও উজ্জল ডোম ও দয়াল ডোমকে খবরের কাগজে খাবার মুড়ে দেয়। নিজ বন্ধুদের সামনে তারা ভীষণ লজ্জা পায় এবং হোটেল থেকে বের হতে চায়। তাদের এমন অবস্থা দেখে তাদের এক বন্ধু হোটেল মালিককে অভিযোগ করে হোটেল কর্মচারীর এই আচারণের বিরুদ্ধে। হোটেল মালিক তখন তার কর্মচারীর পক্ষ নিয়ে বলে যে উজ্জল আর দয়াল তো সুইপার মেথর ওদের তো হোটেলে ঢোকার অনুমতি নাই খাবার তো দূরের কথা। দু-এক কথায় হোটেল মালিক, কর্মচারীর ও উজ্জল দয়ালের বন্ধুদের সাথে বাকবিত-া শুরু হয়। পরে স্থানীয় লোকজন মিলে ঝগড়ার সমস্যা সমাধান করলেও হরিজনদের প্রতি হোটেল রেষ্টুরেন্টে যে বৈষম্য প্রদর্শন তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানায়নি। সুন্দরগঞ্জসহ গাইবান্ধা জেলার দলিত হরিজন সমাজ প্রতিনিয়ত অস্পৃশ্যতাসহ সকল প্রকার বৈষম্যের শিকার হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

অধিকারের সময় হরিজনরা বঞ্চিত। চাকরি করতে গেলে কেউ যদি জানতে পারে তারা হরিজন তা হলে তাদের চাকরি হয় না। যারা ফলে হরিজনরা তাদের আত্মপরিচয় লুকাতে বাধ্য হয়। পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগে দলিতদের ৮০ শতাংশ কোটা থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা মানা হয় না। এর মধ্যে রেলওয়ে পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ হয়ে গেল যেখানে এ নিয়ম মানা হয়নি। পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগে অহরিজন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক নিয়োগ করা হয়।

গাইবান্ধা জেলার দলিত সম্প্রদায়ের শিশুরা আগের চেয়ে অধিকহারে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দারিদ্রতা এবং সামাজিক অবজ্ঞা ও উপেক্ষার কারণে তাদের মধ্যে ড্রপ আউটের হার অত্যাধিক। ফলে এই জনগোষ্টির মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত মানুষ

নগণ্য। দলিতদের মধ্যে নাজুকতর প্রধান এক ক্ষেত্র হল স্বাস্থ্য। তারা যেহেতু চিরস্থায়ী দারিদ্রে থাকেন সেহেতু স্বাস্থ্যের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। হাট বাজার রাস্তা ড্রেন টয়লেট অফিস আদালত পরিষ্কারের কাজ কোন রকম সুরক্ষা ব্যবস্থা করেন, এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি কোন রকমের উদ্যোগ বা ভূমিকা কোনদিনও নেওয়া হয়নি। মাদক একটি সমস্যা আছেই।

গাইবান্ধা জেলার দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দারিদ্র্যতার প্রকোপ অত্যাধিক। আর্থিক অসমার্থ্যের কারণে তারা ছেলেমেয়েদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে না। ফলে ওই সন্তানেরাও দারিদ্র্যের চক্র থেকে বের হতে পারে না। বিভিন্ন এনজিওর লোন ও চড়া সুদের চক্রে পড়ে সর্বশান্ত নিঃস্ব হচ্ছেন গাইবান্ধা জেলার সব উপজেলার দলিত সম্প্রদায়ের সদস্যরা।

গাইবান্ধার জেলায় দলিত জনগোষ্ঠীর মাঝে বেকারত্ব একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সামাজিক অস্পৃশ্যতার করণে তারা প্রথাগত কাজের পরিসর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। দলিতদের মধ্যে পারিবারিক পরিসরে তীব্র পুরুষতান্ত্রিকতা বিদ্যমান। সাধারণভাবে নারী সেখানে সামাজিক ও পারিবারিক পরিমন্ডলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখতে পারে না। বাল্য বিয়ে ও যৌতুকের প্রাদুর্ভাব দলিত ব্যাপক। গাইবান্ধা জেলার দলিত নারীরা দলিত হওয়ার কারণে সামাজিকভাবে ও নারী হওয়ার কারণে নিজ সম্প্রদায়ে নিজ পরিবারের কাছে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন।

গাইবান্ধা জেলার দলিত সম্প্রদায়ের মানুষেরা রেল ষ্টেশনের পাশে হাট বাজারের সাথে একত্রিত হয়ে বসবাস করেন। কিন্তু জীবিকা নির্বাহের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করেন। গাইবান্ধা জেলার সকল উপজেলায় দলিত কলোনীগুলো ও যে স্থানে ঘর করে বসবাস করেন তার মালিকানাও তাদের নয়। ফলে স্থানীয় প্রশাসন ও লোকজনের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে তাদের বাসস্থানের অধিকার। গাইবান্ধা জেলার সর্বত্র দলিত পরিবারগুলো থাকার জায়গা অতি অপ্রতুল। অনেকে একটি ঘরে পুরো পরিবার বসবাস করছে। জেলার সর্বত্র সকল দলিতরাই ভূমিহীন। দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষেরা চিরস্থায়ী এক উচ্ছেদ আতঙ্কে থাকে। অস্পৃশ্যতার কারণে দলিতদের পক্ষে কলোনীর বাইরে বাসা ভাড়া নেওয়া অসম্ভব।

এ জনগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই হীনস্বাস্থ্য, ক্ষুধা, বেকারত্ব, অপুষ্টি, দীন বাসস্থান, দারিদ্র, অভিগম্যতায় বাধা, পানি, পয়ঃনিস্কাশন, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য সকল মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সমাজের একপ্রান্তে পড়ে থাকা লাঞ্ছিত এ জাতিসত্তার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অধিকারী। সময়ের কালস্রোতে দলিতদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়, ধর্ম, প্রথা, ভাষাসহ সকল ঐতিহ্য বিলুপ্তির পথে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এদেরকে মেথর, সুইপার, অস্পৃশ্য, অচ্ছুত, দলিত যেভাবে-যেনামেই ডাকুক না কেন বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির অধিকারী এই জনগোষ্ঠী আজ পর্যন্ত অবহেলিত এবং বঞ্চিত জনগোষ্ঠী হিসেবেই কোনমতে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। জেলার দলিতরা সবাই ভোট অধিকার ভোগ করেন। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের আর কোনো অর্জন বা অবদানের সুযোগ একেবারেই নেই। সামাজিক, নাগরিক, রাজনৈতিক কোন সংগঠন ও সামাজিক কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কোনো কমিটি এবং কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় না।

গাইবান্ধা জেলার দলিত সম্প্রদায়ের সমস্যাসমূহ

১৯. হাতে গোনা দু'চার দলিত নিজস্ব জমিতে বাড়ি ঘর তুলে বসবাস করতে পারলেও তারা মূলতঃ খাস জমি (Khas Land), সরকারি জমি (Public Property) যেমন- অব্যবহৃত কিংবা পতিত জমিতে আশ্রয় নিয়ে বসবাস করছেন, যে আশ্রয়স্থলটুকু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে কোন সময় অধিগ্রহণ বা হুকুম দখল করা হলে তারা হঠাৎ করে আশ্রয়হীন হওয়ার আশংকায় সর্বদা দিন অতিবাহিত করে।

২০. দলিত জনগোষ্ঠীর কাছে বৃহত্তর ধর্মীয় সম্প্রদায় দুটোর লোক জমি বিক্রি করতে রাজি হন না। এমনও ঘটনা আছে যে, কেউ স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে উদার নৈতিকভাবে দলিত জনগোষ্ঠীর কোন পরিবারের কাছে জমি বিক্রি করেন ঠিকই কিন্তু এলাকাবাসীর বাধার কারণে সেই দলিত পরিবারটিকে জমির দখল নিতে পারেনি। পরে

বাধ্য হয়ে ঐ জমি দলিত পরিবারটি অন্য কারো কাছে বিক্রি করেছে বা আইনানুগভাবে দলিল বাতিল করে টাকা ফেরৎ নিতে বাধ্য হয়েছে।

২১. গাইবান্ধা জেলার অন্যান্য স্থানে বসবাসরত দলিতরা সাধারণতঃ কলোনীতে বসবাস করেন। যে সব কলোনী সরকারি উদ্যোগেই স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু গাইবান্ধা পৌর এলাকার দলিতদের দীর্ঘদিনের দাবী হিসেবে আজ পর্যন্ত একটিও দলিত কলোনী স্থাপিত হয়নি।

২২. সংস্কৃতিগত পার্থক্য থাকার কারণে বৃহত্তর ধর্মীয় সম্প্রদায় দুটোর মাঝখানে বসবাস করে দলিত সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানাদি পালন করতে গিয়ে প্রায়শঃ বাধার সম্মুখীন হন কিংবা অন্য সম্প্রদায় মানুষদের অসহিষ্ণু আচরণের শিকার হন।

২৩. এটা পরিতাপের বিষয় যে, দলিত সম্প্রদায় ব্যতিত দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজটি সম্ভব নয়। অথচ দলিতদের নিজেদের স্যানিটেশন সুবিধা বলতে তেমন কিছু নেই বললেই চলে।

২৪. দলিতদের জমির নিজস্ব মালিকানা নেই বলে আশ্রয়স্থল কিংবা কলোনীতে নিজেদের ইচ্ছা মতো বাড়ি ঘর তুলতে পারে না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দলিতরা খুব সামান্য জায়গায় গাদাগাদি করে বসবাস করে। আশ্রয়স্থলে সংকীর্ণ জায়গায় অধিক সংখ্যক মানুষ বসবাস করার কারণে খাবার ও গোসলের পানি, ল্যাট্রিন, পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা, চলাচলের রাস্তা ইত্যাদির অবস্থা শোচনীয়। সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অবহেলা ও ঔদাসিন্যের কারণে দলিত জনগোষ্ঠী বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাদের প্রাপ্য সেবাসমূহ থেকে বঞ্চিত।

২৫. বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলিত জনগোষ্ঠীর সন্তানরা ভর্তি হতে গিয়ে নানাবিধ তিক্ত অভিজ্ঞতাসহ অধিকার বঞ্চনার শিকার হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান দলিত জনগোষ্ঠীর সন্তানকে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে গিয়ে গোষ্ঠীর পদবী কিংবা নামের শেষ অংশ পরিবর্তন করতে উৎসাহিত করেন বা নাম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এমনভাবে পদবী পরিবর্তন করে দেয় যে, ঐ শিশুটিকে আর দলিত বলে চেনাই যায় না। এ কারণে পূর্ব অভিজ্ঞতার জের ধরে দলিত সম্প্রদায়ের অনেকে বাধ্য হয়ে আগে থেকেই হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পদবি যেমন রায়, দাস ইত্যাদি গ্রহণ করছে। যদিও বিষয়টি মানবিক দিক থেকে চরম অবমাননাকর। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অসাম্প্রদায়িকতার সচেতনতামূলক পাঠ্যক্রম বা কার্যক্রম না থাকায় সহপাঠীদের তরফ থেকে অবহেলা ও অবমাননার শিকার হয়ে দলিত শিশুরা লেখাপড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে অকালে ঝরে পড়ে (Drop out)।

২৬. বর্তমানে অনেক সরকারি চাকুরীতে পরিচ্ছন্নতা কর্মী পদে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোককেও নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। বাস্তবতার নিরিখে এটি দোষের কিছু নেই। কিন্তু যেহেতু দলিত জনগোষ্ঠী শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর হবার কারণে তদুপরি সমাজের সর্বত্র অভিগম্যতার (Accessibility) সুযোগ হীনতায় অন্যান্য পেশায় যাবার সুযোগ পায় না। তাই এক্ষেত্রে এরকম নিয়োগের বিষয়টি বরং দলিত জনগোষ্ঠীর বেকারত্বের হারকে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

২৭. দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক কোন উপাসনার স্থান কিংবা উপাসনালয় নেই। যে কারণে তারা বাধ্য হয়ে অন্য একটি জনগোষ্ঠীর উপাসনালয়ে গিয়ে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করার চেষ্টা করে, যদিও তাদের নিজস্ব ধর্ম-সংস্কৃতি রয়েছে। আর এভাবে অন্য সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে গিয়ে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করার বিষয়টি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ায় পরিণত না হয়ে বরং দলিতদের ধর্ম ও সংস্কৃতি বিলীন হওয়ার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। এক্ষেত্রে দলিতরা তাদের নিজস্ব কোন পুরহিত না থাকায় হিন্দু পুরোহিতকে তাদের অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার জন্য নিয়ে আসে এবং হিন্দু ধর্মের বেশীরভাগ দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করে থাকে। অনুষ্ঠানস্থলে এসে ঐসব পুরোহিতরা যতদ্রুত সম্ভব ঝটপট পূজা সেরে বিদায় নিতে চান এবং অনেক ক্ষেত্রে অধিক সম্মানী আদায় করে নেন।

২৮. দলিত সম্প্রদায়ের কোন সদস্য মারা গেলে তারা ঐ মৃত সদস্যকে সমাহিত করে। পুরো গাইবান্ধা জেলায় আজ পর্যন্ত দলিত সম্প্রদায়ের জন্য কোন পৃথক সমাধিস্থল না থাকায় দলিতরা বাধ্য হয়েই হিন্দুদের শশ্মানঘাটের আশে পাশে জমিতে মৃত ব্যক্তিকে সমাহিত করে এবং এটি করতে গিয়ে তাদেরকে অনেক সময়

নানাবিধ ঝামেলার শিকার হতে হয়। অনেক সময় ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও দলিতরা এসব সমাধির কোন চিহ্ন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারে না।

২৯. তথ্য প্রযুক্তির যুগে বাস করেও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর চেয়ে দলিতরা অনেক বেশী কুসংস্কারের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে। এক্ষেত্রেও সমাজের সর্বত্র অভিগম্যতার বিষয়টি তাদের ক্ষেত্রে সাবলীল নয় বলে হীনমন্যতার কারণে অনেক বড় স্বাস্থ্যগত সমস্যার ক্ষেত্রে তারা সরকারি হাসপাতাল কিংবা অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা নিজেদের জন্য নিশ্চিত করতে না পেরে কবিরাজি, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে থাকে। একারণে দলিত পল্লীতে রোগ বালাই যেন চিরসঙ্গী। দলিতদের অনেকেই এখনও এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে, আজকের জন্য বাঁচো, আগামীকালটা ভগবানই দেখবেন- কাজেই যখন যেটুকু উপার্জন হবে তাই দিয়ে একই সংগে খাদ্য দ্রব্য ও নেশা দ্রব্য কিনে খেয়ে দেয়ে সবাই মিলে আমোদ ফুর্তিতে শেষ করে দেয়াই উচিৎ। একারণে ভবিষ্যতের জন্য তাদের সঞ্চয় বলে কিছু নেই। নিজ সম্প্রদায়ের জন্ম নেয়ার বিষয়টিকে তারা ভাগ্যের লিখন বা পরিহাস বলে ভাবতে এক রকম স্বস্তিবোধ করে। আরো একটি বিশ্বাস দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকট যে, তারা যেহেতু দুর্গন্ধময় ময়লা-আবর্জনা পরিস্কারের কাজে নিয়োজিত তাই এসব কাজ শুরু করার আগে ও পরে নেশাসক্ত হয়ে থাকলেই কাজটি সহজে সম্পন্ন করা যায়। যে কারণে তাদের মধ্যে নেশাসক্তদের পরিমাণ দিনে দিনে বাড়ে বৈ কমে না। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনোগঠন এমন পর্যায়ে পৌছেনি যে, একজন দলিত সর্বসাধারণের জন্য পরিচালিত রেস্তোরাঁ কিংবা অন্যান্য খাবার দোকানে গিয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে বসে আহার করবে- এটা সহজে মেনে নিবে। যে কারণে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ অনেক সময় ক্ষুধার্ত অবস্থাতে খাদ্য গ্রহণে জটিলতার শিকার হন।

৩০. স্থানীয় অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের অসহিষ্ণু আচরণের কারণে দলিত পরিবারকে এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়ার ঘটনা বিরল নয়। এক্ষেত্রে অন্য সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর পরধনলোভী ও ধান্দাবাজ মানুষ কর্তৃক সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত দূর্বল দলিতদের সম্পত্তি দখল করার হীন প্রচেষ্টা দায়ী।

৩১. দলিতদেরকে বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করার হীন উদ্দেশ্যে তাদেরকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে অহেতুক হয়রানী করার ঘটনা প্রায়শঃ ঘটে। যার মূল উদ্দেশ্য দলিতদেরকে বাসস্থান ত্যাগে বাধ্য করে তাদের আশ্রয়স্থল টুকু কেড়ে নেয়া। দলিতদের গৃহে প্রস্তুতকৃত মদ্যপান করা তাদের সংস্কৃতির অংশ। এই বিষয়টিকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লাইসেন্সবিহীন মদ উৎপাদনকারী, ব্যবহারকারী, সংরক্ষণকারী কিংবা বিক্রয়কারী হিসেবে আইন-প্রশাসনের কাছে তথ্য দিয়ে কিংবা প্রভাবিত করে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় জড়িয়ে দলিতদেরকে হয়রানী করার বিষয়টি এত বেশী ঘটছে যে, গাইবান্ধা জেলা জজ আদালতের বিভিন্ন ফৌজদারী আদালতে দলিতদের বিরুদ্ধে এই আইনে দায়েরকৃত অসংখ্য মামলা বিচারাধীন এবং এসব মামলার খরচ চালাতে গিয়ে অনেক দলিত পরিবার তাদের শেষ সম্বলটুকু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে।

মোটকথা দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, বিনোদনের অভাবসহ কর্মসংস্থানের সুযোগজনিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বঞ্চনার কারণে দলিত সমাজে বাল্যবিবাহ, পারিবারিক কলহ বিবাদ, মাদকাসক্তি ইত্যাদি সমস্যায় দলিতরা এমনভাবে আষ্টেপিষ্ঠে বাধা পড়েছে যে, সমাজের মূল স্রোতধারা থেকে তারা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবেতর এবং চরম হতাশাজনক জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে।

প্রতিবন্ধীদের অধিকার

আমাদের দেশে আনুমানিক দেড় কোটি প্রতিবন্ধী মানুষ রয়েছে। এর মধ্যে ২৮% শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ৩২% দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ২২% শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ৭% বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ১১% একাধিক বা বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। এসব প্রতিবন্ধীরা স্বাধীনভাবে চলাফেরার ক্ষেত্রে এখনও বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও দূর্ব্যবহার এর শিকার হলেও কোন প্রতিকার পাচ্ছে না। শতকরা প্রায় ৪ ভাগ প্রতিবন্ধী শিশু যেকোন এক ধরণের শিক্ষার সুযোগ পায়। হাসপাতালগুলোতে তাদের প্রবেশাধিকার সীমিত এবং তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা যেমন কৃত্রিম পা লাগানো বা এ সংক্রান্ত উপকরণ, থেরাপি ইত্যাদির ব্যবস্থা নেই। প্রায় এক চতুর্থাংশের কম প্রতিবন্ধী চাকরী করে এবং ৮৭ ভাগ প্রতিবন্ধী এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই চাকরি ত্যাগ করে। গাইবান্ধার সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোতেও প্রতিবন্ধীদের আলাদা ও অগ্রাধিকারমূলক সেবার ব্যবস্থা নেই। বিপণি বিতানে হুইল চেয়ারের জন্য র‍্যাম্প নেই। এই অবহেলিত বৃহৎ সংখ্যালঘু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে হলে প্রয়োজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা। এই অধিকার সুনিশ্চিতকরণে প্রাথমিক পদক্ষেপ হতে পারে প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এবং স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কিংবা প্রতিনিধিত্বের পথ প্রশস্ত করা। গণমাধ্যমগুলো এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী পৃথিবীর ১৫% জনগোষ্ঠী কোন না কোন ধরনের প্রতিবন্ধীতার শিকার। পৃথিবীর এই ১৫% প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের' বাস এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। এদের মাঝে বেশির ভাগই দরিদ্র এবং তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে অসচেতন। এ অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহ ১৯৯২-২০০৩-কে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দশক ঘোষণা সত্ত্বেও দেখা যায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের জন্য প্রণীত আইনের বাস্তবায়ন ঘটানোর জন্য সরকারের সাথে সক্রিয় অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে পারছে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এই প্রান্তিকতা যতটুকু না প্রতিবন্ধকতার কারণে তার চেয়ে আমাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার থেকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি শারীরিক এবং মানসিকভাবে নির্যাতন, বৈষম্য, দয়া-দক্ষিণা, করুণা, অনুকম্পা ও বঞ্চনার শিকার। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চাকরি এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মকা- তারা ভীষণভাবে বৈষম্যের শিকার। তাই উন্নয়নের মূল স্রোতে তারা প্রায়ই অনুপস্থিত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিবছর ৩ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করে আসছে। এবারের প্রতিবন্ধী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় 'একীভূতকরণ: সক্ষমতার ভিত্তিতে সকল প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়ন'।

প্রতিবন্ধী কারা

বয়স, লিঙ্গ, জাতি, সংস্কৃতি বা সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী আর দশজন যে কাজগুলো করতে পারে ইমপেয়ারমেন্টের কারনে সে কাজগুলো প্রাত্যহিক জীবনে করতে না পারার অবস্থাটাই হল ডিসএবালিটি বা প্রতিবন্ধীতা। ইমপেয়ারমেন্ট হল দেহের কোন অংশ বা ইন্দ্রিয় যদি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে, ক্ষণস্থায়ী বা চিরস্থায়ীভাবে তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারায় সে অবস্থাটিকেই বোঝায়। সাধারণত শারীরিক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, বাক প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, বহুবিধ প্রতিবন্ধী প্রভৃতি ধরনের প্রতিবন্ধী দেখা যায়।

আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তবলী এবং ঘোষণাপত্রসমূহ

- প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ (১৯৭৫) প্রতিবন্ধীত্ব প্রতিরোধ পূনর্বাসন এবং প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সহঅধিকার সম্পর্কীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।
- এসকাপ ঘোষণাপত্র (১৯৯৩) এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সমঅধিকার।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ সিআরপিডি তে (United Nations Convention on the Rights of the Persons with Disabilities) বাংলাদেশ অনুসমর্থন দিয়েছে।
- জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে শতাব্দী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণ এবং সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান পর্যাপ্তভাবে সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা, চাকুরীর নিশ্চয়তার বিধান রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান প্রতিটি নাগরিকের জন্য সমান অধিকার ঘোষণা করেছে (অনুচ্ছেদ ১৫, ১৭, ২০, ২৯)। ৩ অক্টোবর ২০১৩-তে পাস হয় বহুল আকাঙ্ক্ষিত 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষাবিল, ২০১৩'। আইনে প্রতিবন্ধীতার ধরণ হিসেবে মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী, অটিজম, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধীসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধীকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার হিসাবে সবক্ষেত্রে সমান আইনি স্বীকৃতি, স্বাধীন মত প্রকাশ, সমন্বিত শিক্ষায় অংশগ্রহণ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, সংস্কৃতি ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষাসংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি' নামে একটি কমিটি থাকবে। সমাজকল্যানমন্ত্রী কমিটির সভাপতি হবেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মন্ত্রানালয় ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কাজে সমন্বয় করবে এই কমিটি। এর বাইরে সমাজকল্যান সচিবের সভাপতিত্বে নির্বাহী কমিটি থাকবে, যার কাজ হবে সমন্বয় কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা। প্রতিবন্ধীর অধিকার বাস্তবায়নে জেলা,উপজেলা ও শহর এলাকায় কমিটি থাকবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিবন্ধন ও পরিচয়পত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার কমিটির কাছে আবেদন করবে। গণপরিবহনে মোট আসনের ৫ শতাংশ প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এই আইনে।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধীতার অজুহাতে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর ভর্তির আবেদন প্রত্যাখান করতে পারবে না। এছাড়া প্রতিবন্ধীতার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভে বাধা দিলে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলে, কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করলে এবং প্রকাশনা ও গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধী মানুষ সম্পর্কে নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করলে তা দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরণের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ তিন বছরের ও পাঁচ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রেখে আরও বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি অসত্য ও ভিত্তিহীন তথ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধিত হলে সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদ- ও ১০ হাজার টাকা জরিমানাযোগ্য অপরাধে দ-িত হবেন। আর কোন ব্যক্তি জালিয়াতির মাধ্যমে পরিচয়পত্র তৈরি করলে তার সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদন্ড ও পাঁচ লাখ টাকা জরিমানার বিধান করা হয়েছে।

তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক কমিশন গঠনের প্রস্তাবটি সংযোজিত হলে আইনটি পূর্ণতা পেতো বলে মনে করেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের জন্য কর্মরত সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো। তারা বলেন ২০০১ সালে করা প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনেও জাতীয় সমন্বয় কমিটি, নির্বাহী কমিটি এবং জেলা কমিটি ছিল। ২৩টি ধারাসংবলিত ওই আইনের ১২টিই ছিল কমিটিগুলোর গঠন, দায়িত্ব, সভা এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত। কিন্তু সেসব কমিটি কাগজে কলমেই ছিল, বাস্তবে এসব কমিটির কাছ থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কোনো সুফল পাননি। আর সে জন্যই নতুন আইনে কমিশনের বিধান রাখার দাবী ছিল, যাতে কমিশনের কাছে অনন্ত অভিযোগ করা যায়।

নারীর প্রতি সহিংসতা এবং প্রতিবন্ধী নারী

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারীর হিসাবে এদেশে নারী প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ৭০ লক্ষের মত। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গ্রামের প্রতিবন্ধী নারীরা সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। তাঁরা সমাজের 'জেন্ডার বৈষম্য' এবং 'প্রতিবন্ধীদের প্রতি অবহেলা' এই দুই মারাত্মক সামাজিক বৈষম্যের শিকার। তাঁদেরকে শুধুমাত্র সমাজের দুর্বল অংশ হিসাবেই দেখা হয় না বরং পরিবারের অনুপার্জনশীল বোঝা হিসাবেই ধরে নেয়া হয়। উপরন্তু তাঁরা নারীত্বের গুণাবলীহীন মানুষ হিসাবে পরিগণিত হয়। প্রতিবন্ধী নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টির জড়িয়ে রয়েছে তার ক্ষমতাহীনতা যার ফলে সে বিতাড়িত হয় সমাজ জীবন থেকে, বঞ্চিত হয় শিক্ষা থেকে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে। আর ধামাচাপা পড়ে যায় তার প্রতি সংঘটিত সহিংসতার ঘটনা। প্রতিবন্ধী নারীর নির্যাতিত হবার অভিজ্ঞতা ও শঙ্কা একজন অপ্রতিবন্ধী নারীর চেয়ে কোন বিবেচনায়ই কম নয়। অপর্যাপ্ত গবেষণার কারণে প্রতিবন্ধী নারীর প্রতি সহিংসতার আলাদা ধরন জানা এখনো বাকী। প্রতিবন্ধী এ সকল নারীর আইনানুগ অধিকার এবং সহযোগিতার সুযোগ বিষয়গুলো আলোচনার দাবি রাখে। সামাজিক ন্যায়বিচার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে বিষয়টি খুবই জরুরি।

গত ০১ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে 'দৈনিক আজকের জনগণ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রতিবন্ধী নারীকে নির্যাতন ও চুল কর্তন" গ্রেফতার ১' শীর্ষক সংবাদ শিরোনামের ঘটনাটি ছিল এমন–

চুরির অপবাদ দিয়ে প্রতিবন্ধী এক গৃহীনিকে পানিতে ফেলে দিয়ে মারপিট এবং চুল কেটে দিয়েছে এক বিত্তবান প্রভাবশালী। এ ব্যাপারে মামলা দায়ের করা হলে পুলিশ অভিযুক্ত রিজু মিয়াকে গ্রেফতার করেছে। এই বর্বর ঘটনা ঘটেছে গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে। পলাশবাড়ী থানার ওসি মজিবুর রহমান জানান, পলাশবাড়ী উপজেলার জামালপুর গ্রামের বাসিন্দা রিজু মিয়া। তিনি বিত্তবান পরিবারের ও প্রভাবশালী। তার কথায় ওঠে বসে এলাকার লোকজন। তার পাশের বাড়ির অনোয়ার হোসেনের প্রতিবন্ধী মেয়ে শিল্পী খাতুন (২২)। কিছুদিন অগে বিয়ে দেন শারীরিক প্রতিবন্ধী বুলু মিয়ার সাথে। চলতে ফিরতে পারেনা। শিল্পী খাতুনের মা মর্জিনা খাতুন অন্যের বাড়িতে এর কাজ করে তাদের খাবার যোগান দিয়ে আসছিল। বিয়ের পর থেকে বুলু মিয়া তার স্ত্রী শিল্পী খাতুনকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে বসবাস করে আসছিলেন। কিন্তু এলাকার বিত্তবান রিজু মিয়ার নজর পড়ে শিল্পী খাতুনের উপর। তার কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় রিজু মিয়া তার ঘর থেকে টেলিভিশন চুরি করেছে বলে শিল্পী খাতুনকে অভিযুক্ত করেন। তারপর শুক্রবার সন্ধ্যায় বুলু মিয়া তার স্ত্রী ও মা-কে নিয়ে শিল্পী খাতুনকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে আসে। টেলিভিশন চুরির অপবাদ দিয়ে বুলু মিয়া শিল্পীকে বেদম মারপিট করে। নিপরাধ শিল্পী খাতুন চুরির কথা অস্বীকার করলে তাকে আরও মারপিট করা হয়। প্রভাবশালী রিজু মিয়া তার বাড়ির পাশের একটি পুকুরের পানিতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে প্রকাশ্যে লোকজনের সামনে শিল্পী খাতুনকে মারপিট করে। এসময় তার পিতা আনোয়ার হোসেন এবং স্বামী বুলু মিয়া এগিয়ে এলে রিজু মিয়া তাকেও মারপিটের চেষ্টা করে এবং তাড়িয়ে দেয়। তারপর পুকুর থেকে তুলে তাকে আবারও মারপিট করে মাথার চুল কেটে দেয়া হয়। এতে শিল্পী খাতুন অসুস্থ্য হয়ে পড়লে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। তারপর গ্রামবাসীর সহযোগিতায় তার পিতা গুরুতর অসুস্থ্য অবস্থায় পলাশবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। শরীরের আঘাতের চিহ্ন নিয়ে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে চিকিৎসাধীন শিল্পী খাতুন জানান, আমি গরিব বলে আমার ইজ্জতের দাম নাই। প্রতিবন্ধী শিল্পী ইশারায় বলেন, আমাকে চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে পুকুরের পানিতে চুবিয়ে মারপিট করে চুল কেটে দিলো। আমি এর বিচার চাই। পলাশবাড়ী থানার ওসি মজিবুর রহমান বলেন, এ ব্যাপারে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আমরা অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত রিজু মিয়াকে গ্রেফতার করেছি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধী নারীর প্রতি সহিংসতার অরক্ষিত দিকসমূহ:

- সাধারণ নারী এবং বিশেষত প্রতিবন্ধী নারী শারীরিকভাবে আত্মরক্ষায় তেমন সক্ষম নয়।
- যোগাযোগের অসুবিধা ও বিদ্যমান সেবার সুবিধা না পাওয়ার কারণে সহিংস ঘটনার অভিযোগ করার সমস্যা।
- তথ্য ও আইনী সহায়তা পাওয়া ও তার ব্যবহারের অসুবিধা।
- নারী হিসাবে নিজের ব্যাপারেই নিম্ন ধারণা ও অসম্মান।
- সেবা পেতে বিভিন্ন মানুষের উপর নির্ভরশীলতা।
- ঘটনা প্রকাশ করলে অপরাধী কর্তৃক আবারও নির্যাতনের আশঙ্কা।
- দারিদ্র্যতা এবং অপরাধীর বিপক্ষে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য অপর্যাপ্ত সম্পদ।
- যৌন নির্যাতনের ঘটনা সকলে জেনে ফেললে কলঙ্ক ও সামাজিকভাবে বিতাড়িত হবার আশঙ্কা।
- বিরাজমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্কার এর ফলে প্রতিবন্ধী মানুষদেরকে কতিপয় প্রতিষ্ঠান বিশ্বাসই করে না। ফলে এই জাতীয় অভিযোগ আমলই পায় না।

গবেষণা তথ্য

গবেষণায় দেখা যায় ঘনিষ্ঠ মানুষজনই প্রতিবন্ধী নারীর প্রতি সংঘটিত এসব সহিংসতার জন্য দায়ী। পরিবার, ঘরবাড়ি এবং সেবা প্রদানকারী পরিবেশ যেমন হাসপাতাল, ক্লিনিক প্রভৃতি স্থানে এসব সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। পরিচিত মানুষের মাধ্যমে নির্যাতন বেশি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন পুরুষ কর্তৃক গোপনে, তার নিজের বাসায় বা কোন বন্ধুর বাসায় বা আত্মীয় অথবা কর্মক্ষেত্রে বা নিকটবর্তী অন্য কোন পরিবেশে এসব সহিংস ঘটনা ঘটে।

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে কাজ করে এমন একটি জাতীয় পর্যায়ের সংস্থা এডিডি পরিচালিত এক গবেষণায় ৬২টি ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে ৪৭ জন নারী সহিংসতার শিকার যার মধ্যে ৩২ জন যৌন হয়রানির এবং ৩০ জন

ধর্ষণের শিকার। ৫টি যৌতুক সংক্রান্ত ঘটনার ১টিতে জোরপূর্বক বন্ধ্যাত্ব, ২টিতে যৌতুকের জন্য হত্যা এবং ১টি অর্থ প্রতারণার ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। একথা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন প্রতিবন্ধী নারীর প্রতি সহিংসতার যে তথ্যই আমরা পাই, তা মোট ঘটনার খুবই সামান্য অংশ। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী নারীদের প্রতি সহিংসতা বেড়েই চলেছে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (উপজেলাভিত্তিক -২০১৪-১৫ অর্থ বছর)

উপজেলা	প্রতিবন্ধী ভাতা	প্রতিবন্ধী শিক্ষা বৃত্তি	প্রতি মাসে টাকার পরিমাণ
সদর	১১০৩	৬১	প্রতিবন্ধী শিক্ষা বৃত্তিঃ প্রাথমিক স্তর ৩০০/- মাধ্যমিক স্তর ৪৫০/- উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ৬০০/- উচ্চতর স্তর ১০০০/- প্রতিবন্ধী ভাতা ৫০০/-
সাদুল্যাপুর	৮৯০	২৯	
পলাশবাড়ী	৭৮৩	৩৫	
গোবিন্দগঞ্জ	১৫৫৮	১০৩	
সুন্দরগঞ্জ	১৩৪৫	৪০	
ফুলছড়ি	৪৬৯	১৫	
সাঘাটা	৮৩৯	২৫	
শহর সমাজ সেবা অধিদপ্তর	২১১	৩৩	
সর্বমোট=	৭১৯৮	৩৪১	

উপজেলা/ইউসিডিভিত্তিক পরিবীক্ষণ ছক

জেলার নাম : গাইবান্ধা।

উপজেলা/ ইউসিডি'র নাম	ইউনিটভিত্তিক তথ্য (সংখ্যায়)			পরিবারভিত্তিক তথ্য			প্রতিবন্ধী ব্যক্তিভিত্তিক তথ্য (৩০ এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত)				মোট জনসংখ্যা (বিবিএস অনুসারে)	প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ সংক্রান্ত তথ্য (৩০ এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত)		
	ইউনিয়ন	সিটি/ পৌর ওয়ার্ড	মোট ইউনিট	প্রতিবন্ধী পরিবার	অপ্রতিবন্ধী পরিবার	মোট পরিবার	পুরুষ	মহিলা	হিজড়া	মোট		ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত	ডাক্তার কর্তৃক বাদ পড়া	অনুপস্থিত
গাইবান্ধা সদর	১৩	০	১৩	৫৫৬৪	১০০৭২৬	১০৬২৯০	৩২৭৭	২৩৬০	১৭	৫৬৫৪	৩৬৯৪৩৫	৪৭৬৫	২৯২	৫৯৭
ফুলছড়ি	৭	০	৭	২১৫৬	৪০৪৩০	৪২৫৮৬	১২৪৮	৯২৯	১	২১৭৮	১৬৫৩৩৫	১৫২৭	২৩০	৪২১
সাদুল্যাপুর	১১	০	১১	৪৬৩৭	৭০৫৯৮	৭৫২৩৫	২৭১০	১৯২৭	১	৪৬৩৭	২৮৭৪২৬	৩৪৭৭	১৮২	৯৩১
গোবিন্দগঞ্জ	১৭	০	১৮	৬২৮৮	১২৪০০৭	১৩০৫৯৫	৩৯৮৯	২৫৮১	১৮	৬২৮৮	৫১৫৮৮৮	৩৯৮৩	৪৭৫	২১৩০
সাঘাটা	১০	০	১০	৫৫০৩	৬৩৪৮৯	৬৮৯৯২	৩৩০১	২২৭৭	২৮	৫৬০৬	২৬৭৮১৯	৩৭৩৯	৮১৬	১০৫১
শহর সমাজ সেবা কার্যালয়	০	৯	৩	৯৮৭	১৪৪৪৩	১৫৪৩০	৬২০	৪১৭	০	১০৩৭	৬৭৮৩৩	৮৯০	১০	১৩৭
সুন্দরগঞ্জ	১৬	০	১৬	৮৫০০	১১২৭৮৭	১২১২৮৭	৪৮৩০	৩৬৩৭	৩৩	৮৫০০	৪৫৭৭২০	৪৯৬৯	১৭৭	৩৫২৪
পলাশবাড়ী	৯	০	৯	৪১৬০	৬৬২১৪	৭০৬৭৪	২৩৯৬	১৭৬৩	৯	৪১৬৮	২৪৪৭৯২	২৯৯২	৬৬৩	৫০৫
সর্বমোট =	৮৩	৯	৮৭	৩৮০৯৫	৫৯২৯৯৪	৬৩১০৮৯	২২৩৭১	১৫৮৯১	১০৭	৩৮৩৬৮	২৩৭৬২৩৮	২৬৩৪২	২৮৪৫	৯১২৬

পরিপত্র

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের করণীয়ঃ বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের সম অধিকার, মানব সত্ত্বার মর্যাদা, মৌলিক মানবাধিকার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। তদুপরি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ অনুসমর্থন করেছে বাংলাদেশ। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন,২০১৩ প্রণীত হয়েছে। এই আইন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক। এতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সুরক্ষার জন্য জাতীয় পর্যায়ে, জেলা, উপজেলা ও শহর এলাকায় কমিটি গঠনের বিধানসহ সামগ্রিকভাবে তাদের অধিকার রক্ষার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারের বর্ণনা; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব; সরকারি বেসরকারি ইমারত ভবন, পার্ক, ষ্টেশন, বন্দর, টার্মিনাল, সড়ক ইত্যাদিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার নির্দেশনা ইত্যাদি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯, ইউনিয়ন পরিষদ (পরিকল্পনা) বিধিমালা এবং ইউনিয়ন পরিষদ অপারেশনাল ম্যানুয়েল অনুসারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ নিম্নরূপভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

১. **উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার প্রদানঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদ পঞ্চবার্ষিক এবং বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এ জন্য ইউনিয়ন পরিষদ অপারেশনাল ম্যানুয়েল এবং ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা বিধিমালা অনুসরণ করবে। ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা নিরুপন করা হবে। পরিকল্পনা প্রণয়নে যে পাঁচ স্তর ইউনিয়ন পরিষদ অপারেশনাল ম্যানুয়েল বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এলাকার অবস্থা, অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, সামাজিক মানচিত্র, বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা ও গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, সভা এবং মতবিনিময় করে তথ্য সংগ্রহ। সংগৃহীত তথ্য ওয়ার্ড সভায় উপস্থাপন করা। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় এলাকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যগণের প্রয়োজন বিবেচনায় নেয়ার সুযোগ রয়েছে। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় যে পাঁচটি বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে এর মধ্যে নারী, শিশু ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর সুফল অন্যতম। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য এবং সচিব ওয়ার্ড সভায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের দুরবস্থা লাঘব এবং তাদের প্রয়োজন পূরণে সকল নাগরিককে সম্পৃক্ত করবেন। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রতিবন্ধী বান্ধব করার বিষয়ে সচেষ্ঠ হবেন। তদুপরি ওয়ার্ড সভায় নিধারিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি যেমন, ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ইত্যাদি উপকারভোগীদের চূড়ান্ত অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত ও ইউনিয়ন পরিষদে প্রেরণের সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে। ওয়ার্ড সভায় প্রতিবন্ধী ভোটারগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

২. **বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখাঃ** ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য যথেষ্ট বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ অপারেশনাল ম্যানুয়েলে বাজেট প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হিসেবে বলা হয়েছে, বাজেট তৈরি করার সময় বিবেচনায় রাখতে হবে যেন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুদের ও যুবদের কল্যাণ, প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধগণের জন্য যথেষ্ট বরাদ্দ থাকে। উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশনে অন্যান্য নাগরিকদের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের উপস্থিতিও নিশ্চিত করতে হবে। বাজেট বরাদ্দ অনুসারে ব্যয় করার সময়ও বিবেচনায় নিতে হবে যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যয় হয়।

৩. **উন্নয়ন কর্মসূচি তথা স্কিম বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের প্রয়োজন বিবেচনা করাঃ** লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপিঃ ২), ইউনিয়ন পরিষদ গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (ইউপিজিপি) অথবা অন্য কোন প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদকে যে অর্থায়ন করা হয়ে থাকে সে অর্থ দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদ যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, পানি সরবরাহ, শিক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও বাজার উন্নয়ন, পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন করতে পারে। এর মধ্যে যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, পানি সরবরাহ, শিক্ষা, পয়ঃনিস্কাশন এবং মানব

সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। এ সব খাতে কাজ করার সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের ব্যবহার উপযোগিতার কথা বিবেচনায় নিতে হবে। যেমন স্কুলে বা ভবনে র‍্যাম্প স্থাপন করা। টিউবওয়েল স্থাপন ও টয়লেট নির্মাণের সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের ব্যবহার উপযোগী করা হলে তা সাধারণ মানুষও ব্যবহার করতে পারবে। এ জন্য প্রয়োজন হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিষয়ে কাজ করে এমন দক্ষ ব্যক্তির নিকট থেকে কারিগরী সহায়তা গ্রহণ করা যাবে।

৪. **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকার সম্পর্কে জন সচেতনতামূলক কর্মসূচী:** প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সমাজে বা পরিবারে বাড়তি বোঝা নয়। মানব মর্যাদা এবং মানবিক অধিকার একজন স্বাভাবিক মানুষের এবং একজন প্রতিবন্ধী মানুষের সমান। ইউনিয়ন পরিষদ এ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করবে যাতে জনগণ এ বিষয়ে সচেতন হয়। প্রতিবন্ধী মানুষ করুণার পাত্র নয়, সমাজে আর সকলের মতোই তারা সমান অধিকার ও সমমর্যাদার অধিকারী। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ইউনিয়ন পরিষদের অংশীজন (Stakeholder) হিসেবে বিবেচিত। পিছিয়ে পড়া শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মানুষকে অপরাপর মানুষের সমান অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য যে সুবিধা প্রদান আবশ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্যও ততটুকু প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৫. **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:** ইউনিয়নে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা, এদের মধ্যে পুরুষ, নারী, শিশুর সংখ্যা, তাদের জন্য গৃহীত কর্মসূচী ও সুবিধাদি ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা যেতে পারে। সরকার কর্তৃক জারীকৃত বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র ইত্যাদি নাগরিকের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ ও প্রচার করার বিধান রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তালিকা সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা আবশ্যক, যাতে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সঠিক ব্যক্তিকে সহজে এবং সময়মতো নির্বাচন করা যায়।

৬. **সভাসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণ:** ইউনিয়ন পরিষদের নয়টি ওয়ার্ডে বছরে দু'টি করে মোট ১৮টি ওয়ার্ড সভা; ১৩টি স্থানীয় কমিটি প্রতি দুই মাসে একটি করে সভা; ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি প্রতি দু'মাসে একটি করে সভা; বাজেট চূড়ান্ত অনুমোদন করার আগে উন্মুক্ত বাজেট সভা আয়োজন করা হবে এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করার উদ্যোগে গ্রহণ করতে হবে। ১৩টি স্থায়ী কমিটি ব্যতিত ইউনিয়ন পরিষদ, প্রয়োজনে জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে, অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারবে। আইনের এই বিধানের ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকার সুরক্ষার জন্য একটি স্থায়ী কমিটিও গঠন করতে পারে।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পরিষদের অনুমতি সাপেক্ষে, প্রচলিত আইন অধ্যাদেশ ও বিধি বিধানের পরিপন্থী নয়। এরূপ জনস্বার্থ ও জনগুরুত্বপূর্ণ কোন জরুরী কাজ সম্পাদন করতে নির্দেশ দিতে পারবেন এবং এ ধরনের কাজ সম্পাদনের ব্যয়ভার পরিষদের তহবিল হতে বহনের নির্দেশ দিতে পারবেন। এ বিধানের প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এ এখতিয়ার বলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিশেষ সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ নিতে পারেন।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) কর্তৃক প্রতিবন্ধীতার কাজের ধরণঃ ২০১৫ সাল অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে সহায়ক উপকরণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি-

ক্রমিক নং	সহায়ক উপকরণ এর নাম	সহায়ক উপকরণ প্রাপ্তদের বিবরণ				মোট
		নারী	পুরুষ	ছেলে শিশু	কন্যা শিশু	
০১	হুইল চেয়ার	৫০২	৭১২	৫২০	৪২৮	২১৬২
০২	ট্রাই সাইকেল	০২	২৭	০০	০০	২৯
০৩	ওয়াকার	০০	০১	১৫	১০	২৫
০৪	সাদাছড়ি	১৪	৪০	০২	০২	৫৮
০৫	বিশেষ চেয়ার	০	০	৩৬	২৫	৬১
০৬	কৃত্রিম পা	০১	০৯	০	০	১০
০৭	চশমা	০৫	১৬	১২	১৮	৫১
০৮	স্পিন্ট	০	০	০৫	০৩	০৮
০৯	এ্যাডাপটেট সুজ	০	০	০৪	০৩	০৭
১০	শ্রবনযন্ত্র	০১	০২	৭৮	৪১	১২২
১১	এ্যালবো ক্রাচ	০৫	১৮	০০	০০	২৩
১২	অক্সিলারী ক্রাচ	০৯	১৮	০০	০০	২৭
১৩	এএফও	০	০	১২	০৯	২১
১৪	কেএএফও	০	০	১০	০৯	১৯
১৫	ষ্টান্ডিং ফ্রে	০	০	০৮	০৫	১৩
মোট		৫৩৯ জন	৮৪৩ জন	৭০২ জন	৫৫৩ জন	২৬৩৬ জন

প্রতিবন্ধীতা প্রতিরোধ চিকিৎসা সহায়তাপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তালিকা

ক্রমিক নং	সহায়ক উপকরণ এর নাম	সহায়ক উপকরণ প্রাপ্তদের বিবরণ				মোট
		নারী	পুরুষ	ছেলে শিশু	কন্যা শিশু	
০১	ছানী অপারেশন	১৮	২১	৫৭	৩০	১২৬
০২	মুগুরপা	০	০	০৮	০৬	১৪
০৩	কাঁটাঠোট ও কাঁটাতালু অপারেশন	০	০	১০	০৮	১৮
০৪	স্কিন গ্রাফটিং	০	০	০২	০১	০৩
০৫	চিকিৎসা সহায়তা (খিচুনি)	১৮	২১	১৬	১১	২৭
মোট		৩৬ জন	৪২ জন	৯৩ জন	৫৬ জন	১৮৮ জন

গৃহভিত্তিক পিআরটি ও থেরাপী সহায়তাপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী শিশু/ব্যক্তিগণের সংখ্যা

ক্রমিক নং	সহায়ক উপকরণ এর নাম	সহায়ক উপকরণ প্রাপ্তদের বিবরণ				মোট
		নারী	পুরুষ	ছেলে শিশু	কন্যা শিশু	
০১	সেরিব্রাল পলসি	০	০	৬০	৩১	৯১জন
০২	মুগুর পা	০	০	০৫	০৪	০৯জন
০৩	প্যারালাইসেস	০৩	০৫	০	০	০৮জন
০৪	জয়েন্ট কন্ডাকচার	০২	০৩	০৩	০১	০৯জন
০৫	মাসকুলার ডিসট্রোফি	০১	০	০৫	০	০৬জন
০৬	স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি	০১	০৫	০	০	০৬জন
০৭	স্পাইনাল বিফিডা	০	০১	০১	০	০২জন

০৮	মেরুজ্জের বিক্রেতা	০১	০৩	০৫	০৪	১৩জন
০৯	স্পিস থেরাপী	০	০৫	০৮	০৬	১৯জন
১০	বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী	০	০	০২	০১	০৩
১১	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী	০	০	০৩	০২	০৫জন
১২	বাকও শ্রবন প্রতিবন্ধী	০	০	০৫	০৩	০৮জন
	মোট	০৮ জন	২২ জন	৯৭ জন	৫২ জন	১৭৯ জন

সুপারিশ:

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবন্ধীতা বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।
- মানসিক অসুস্থতা বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত সংস্থা সমূহের সকল কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।
- চাকরি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোটা প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন করা হোক।
- যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে হবে।
- প্রতিবন্ধীবান্ধব উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে এককালীন অনুদান অথবা সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদাণ করা হোক।
- যেসব শিল্প-কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সেবা-সংশ্লিষ্ট খাত প্রতিবন্ধী মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হোক।
- দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে প্রতিবন্ধী বান্ধব পরিবেশ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ উপবৃত্তি চালু করা এবং আইটি সেক্টরে প্রতিবন্ধীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বাজেট বরাদ্ধ রাখতে হবে।
- সহিংসতা- নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী নারীদের আইনী ও চিকিৎসা সহায়তার লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন।
- দরিদ্র, বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য রেশনিং প্রথা চালু করা হোক, সর্বোপরি বাজেটে সকল উন্নয়ন খাতে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্ধ প্রদান করতে হবে।

পর্ব-চার
প্রাতিষ্ঠানিক পরিস্থিতি

০১. বিচার পাওয়ার অধিকার
০২. বিচারে দরিদ্র মানুষের প্রবেশাধিকার

বিচার পাওয়ার অধিকার

বিচার ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য হল নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিরূপণ করে আইনি প্রতিকার দেওয়া। ১৯৪৮ সালের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় অধিকার সম্পর্কিত যে ২৫টি অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছে তার অন্তত ৬টি অনুচ্ছেদে বিচারের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে।

- আইনের দৃষ্টিতে সমান হওয়ার অধিকার।
- আইনের দৃষ্টিতে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাবার অধিকার।
- নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য শুনানীর অধিকার।
- প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ ব্যক্তির মত আচরণ পাওয়ার অধিকার।
- অমানবিক ও অমর্যাদাকর বিচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার।
- সুনির্দিষ্ট আদালত থেকে বিচার পাবার অধিকার।
- এইসবগুলো অধিকার যুক্ত হয়ে আছে সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থাপনার উপরে। একই সাথে অন্যান্য অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রেও প্রতিকারের জায়গা এই বিচার-ব্যবস্থা।

সংবিধান ও জাতীয় আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৩১-এ বলা আছে যে, 'আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত: আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন,স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।'

কিন্তু প্রচলিত সনাতন বিচার ব্যবস্থায় মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় লাগায় বিচার ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ জনগণ আস্থা হারাচ্ছে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে Justice Delayed is Justice Denied. ওয়াশিংটনভিত্তিক আন্তর্জাতিক অলাভজনক সংস্থা দ্যা ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট এর আইনের শাসন সূচক ২০১২ প্রতিবেদনে ৯৭ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সর্ব তলানীতে। মামলার নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় লাগা ও বিচার ব্যবস্থায় অদক্ষতা এবং দুর্নীতিইকেই দায়ী করা হয়েছে রিপোর্টটিতে। প্রথম সারিতে রয়েছে নরডিক দেশগুলো। বিচারক স্বল্পতা, তদন্তকারী কর্মকর্তার সময়ক্ষেপন, সাক্ষীর অনুপস্থিতি, এজাহারকারীর বিলম্বতা প্রভৃতি কারণে বিচারে বিলম্ব হচ্ছে। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার এই প্রভাব পড়ছে দেশের কারাগারগুলোতে। সুতরাং এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য রাষ্ট্রকেই উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে।

গাইবান্ধা জেলার অবস্থা

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিচার ব্যবস্থা পৃথকীকরণ হলেও বিচারকগণ এখনও প্রভাবমুক্ত নন। অপরদিকে আদালতে যারা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বিশেষ করে প্রসেস সার্ভেয়ার, আদ্দালী, পেশকার, সেরেস্তাদার টাকা ছাড়া কোন কাজই করতে চায় না। প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। আদালতের এজলাশসমূহের বিজ্ঞ আইনজীবিদের বসার স্থান খুবই নিম্নমানের এবং অনেক এজলাশের চেয়ার বেঞ্চগুলো ভাঙ্গা ও বসার অনুপযুক্ত। নতুন আইনজীবিদের দক্ষ করার তেমন কোন ব্যবস্থা নাই। সব আইনজীবিদের বসার জন্য চেম্বারের সংখ্যা অপ্রতুল। বারে একটিমাত্র লাইব্রেরি আছে যেখানে বইপত্রের ঘাটতিও রয়েছে। সেখানে কোন কম্পিউটার বা ইন্টারনেট সংযোগ নেই। ফলে নতুন আইন বিষয়ে আইনজীবিদের জানার সুযোগ কম। আধুনিক যুগে লাইব্রেরিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার না থাকাটা দুঃখজনক। লাইব্রেরিতে আইনজীবিদের বসার ব্যবস্থা তেমন একটা ভালো নয়। অপরদিকে আইনজীবিদের মানসিক রিক্রিয়েশনের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই।

আদালত ও বিচারক এর সংখ্যা

গাইবান্ধা জজ কোর্ট

ক্রঃনং	বিচারকের পদবী	অনুমোদিত সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত	শূন্য পদ
০১	জেলা ও দায়রা জজ	০১ জন	০১ জন	-
০২	অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ	০১ জন	০১ জন	-
০৩	যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ	০২ জন	-	০২ জন
০৪	সিনিয়র সহকারী জজ	০৩ জন	০৩ জন	-
০৫	সহকারী জজ	০৪ জন	০৪ জন	-
০৬	চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট	০১ জন	০১ জন	-
০৭	অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট	০১ জন	০১ জন	-
০৮	সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট	০৩ জন	০১ জন	০২ জন
০৯	জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট	০৪ জন	০৪ জন	
	সর্বমোট=	২০ জন	১৬ জন	০৪ জন

প্রাপ্ত তথ্য মতে দেখা যায় যে, গাইবান্ধা জেলায় মোট অনুমোদিত বিচারকের পদ সংখ্যা ২০টি, এর বিপরীতে কর্মরত আছেন ১৬ জন বাকি ০৪টি পদ শূন্য রয়েছে। শূন্য পদের মধ্যে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজের ০২টি পদ এবং সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ২টি পদ শূন্য রয়েছে।

গাইবান্ধা মানবাধিকার আইনজীবি পরিষদের পক্ষ থেকে জেলার বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে সুপারিশ

১। মামলার জট নিরসনে প্রয়োজন সংখ্যক বিচারক নিয়োগ

পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই জেলা আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া মামলার সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। মামলার এই জট নিরসনের জন্য অনুমোদিত পদের বিপরীতে শূণ্য পদে বিচারক নিয়োগসহ অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত আদালত গঠন করা যেতে পারে। এছাড়া এই সমস্যার থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়।

২. কলুষমুক্ত বিচারাঙ্গন প্রতিষ্ঠা

ক) বিচারাঙ্গণের অধঃস্তন কর্মচারীদের অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ করতে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এখন এক প্রকার সময়ের চাহিদা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এতে আদালত পাড়ায় সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের হয়রানির শিকার হওয়ার পরিমাণ কমে যাবে।

খ) বিচারালয় হওয়া উচিৎ পরিচ্ছন্ন এবং পরিবেশবান্ধব। সকল দোকান পাটগুলোকে একদিকে স্থান দেওয়া, সম্পর্ণরূপে হকার উচ্ছেদ করা (বিশেষ করে প্রতারণার মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রি যা আদালত প্রাঙ্গণে হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে কিনে এবং প্রতারিত হয়), টয়লেটের সংখ্যা বাড়ানো এবং তা নিয়মিত পরিচ্ছন্ন রাখা।

গ) অনতিবিলম্বে চীফ জুড়িশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসির জন্য ভবন নির্মাণ এবং তার জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যেন ম্যাজিস্ট্রেটগণ প্রয়োজনীয় এজলাস পান এবং সুষ্ঠুভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করতে পারেন।

ঘ) মহুরীদের বসবার জন্য দূরবর্তী স্থানে ব্যবস্থা করা, বিচার প্রার্থীদের জন্য বসবাস ব্যবস্থা করা, এক মামলায় নির্দিষ্ট সংখ্যক লোককে আদালত প্রাঙ্গণে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোও ভেবে দেখা যেতে পারে।

৩) জেলা বারের গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ

সাম্প্রতিক সময়ে দেশ-বিদেশের বহু প্রতিষ্ঠান মানবাধিকার বিষয়ক জার্নাল, নানা ধরনের প্রবন্ধ ও বই প্রকাশ করে থাকে। সেগুলো নিয়মিত সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সনদে যেমন : ইউপিআর-তে বাংলাদেশ সরকার এবং নাগরিক সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবেদন পেশ করে যাচ্ছে। যেগুলো সম্পর্কে আইনজীবিদের ধারণা থাকা আবশ্যক। সেগুলো নিয়মিত সংরক্ষণ করা যায়। তথ্য প্রযুক্তির এই সময়ে ইন্টারনেট হাতের নাগালে না থাকায় এবং এর ব্যবহার না জানায় সমকালীন দুনিয়া থেকে আইনজীবিদের এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। একজন প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা করে দু-একটি কম্পিউটার ইন্টারনেট সংযোগসহ গ্রন্থাগারে রাখা হলে সেগুলো আইনজীবিগণ নিয়মিত ব্যবহার করতে পারেন।

৪) তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

জেলা বা জাতীয় পর্যায়ের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় জেলা বারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রদান করা জরুরী। পত্রিকায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অথবা মানববন্ধন, র‍্যালি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানানো যেতে পারে। উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্র প্রেরণ এবং কাজ না হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এর ফলে অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ করতে সাহস পাবে এবং যথাযথ করণীয় নির্ধারণ করতে পারবে।

৫) আইনজীবীদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে ভূমিকা রাখা

আইনজীবী সমিতি একটি অভিভাবক সংগঠন। এর সদস্যদের যথাযথ করে গড়ে তুলতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এই সমিতি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গত ৫ বছরে অন্তর্ভুক্ত নবীন আইনজীবীদের তালিকা ধরে তাদের জন্য অধিকার, মানবাধিকার, জনস্বার্থে মামলা, পলিসি এ্যাডভোকেসি, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদে অন্তর্ভুক্তির উপায়, বিভিন্ন জাতীয় নীতিমালা, সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ইত্যাদি বিষয়ে বারের আয়োজনে নিয়মিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে। শহরের বা জাতীয় পর্যায়ের উপরোক্ত বিষয়গুলোর ওপরে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ সেই আলোচনা পরিচালনা করতে পারেন। এছাড়া জেলা বারের তত্ত্বাবধানে স্ব-কালীন (তিন মাস বা ছয় মাসব্যাপী) চালু হতে পারে সার্টিফিকেন্ট কোর্স। আইন ও মানবাধিকার নিয়ে কর্মরতদের সাথে যোগাযোগ সাপেক্ষে তাদের প্রশিক্ষণগুলোতে নিজেদের সদস্য প্রেরণ করা যেতে পারে। আদালত কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ রায়, সরকার প্রণীত নীতিমালা ইত্যাদি বিষয়ের ওপরে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। এই রকম নানামুখী উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করা সম্ভব।

৬) মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব বা অভিভাবকত্বের ভূমিকা গ্রহণ

এদেশে মানবাধিকার কার্যক্রম মূলত পরিচালিত হয়ে আসছে বিভিন্ন এনজিও বা দাতা সংস্থার মাধ্যমে। কর্মসূচিগ্রহণ বা পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভূমিকা এখানে পর্যাপ্ত নয়। দাতা-গ্রহীতার টানা পোড়নে যথাযথ এবং সমন্বিত কার্যক্রম অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। তবে সত্যি যে এর মধ্য দিয়ে এক ধরনের মানসিক নির্ভরতাও তৈরি হয়। মানবাধিকার কার্যক্রমে জেলা পর্যায়ের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের অংশগ্রহণ যেন শুধু আইন সহায়তার মধ্যেই

সীমাবদ্ধ। এই প্রেক্ষাপটে সুপারিশ হলো পুরো জেলার মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণাপত্র প্রস্তুত, পরিস্থিতি উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট করণীয় সম্পর্কে নীতিমালা প্রণয়ন শেষে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় সকল স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে বসে দিক নির্দেশনা প্রদান করা। মানবাধিকার লংঘনজনিত ঘটনাসমূহ চিহ্নিত করে উচ্চ আদালতে জনস্বার্থে মামলা দায়েরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। জেলা পর্যায়ে আইন সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিক্ষিপ্তভাবে কাজ না করে সমন্বিত পন্থার মধ্য দিয়ে যেতে উৎসাহিত করা। সরকারি ও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম দুর্নীতি চিহ্নিত করে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের ঘোষণা ও প্রকৃত সেবার মধ্যে তারতম্য পাওয়া গেলে আইনের আওতায় নিয়ে আসা। উপরোক্ত বিষয়গুলি নীতিগতভাবে গ্রহণ করলে কাজের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

৭) বারের চলমান সংবিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন পদে নির্বাচিত সদস্যদের জন্য এক বা দুই বছরের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নির্ধারণ ও ফলোআপ

পত্রিকা প্রকাশনা, বাৎসরিক বনভোজন, নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, বিভিন্ন রকম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন, পরিবারসহ বিশেষ অনুষ্ঠানাদি, ইত্যাদি নিয়মিত করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া। যে যে সম্পাদকের এই আয়োজনসমূহ করার কথা তাঁর জন্য যাবতীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করা। মানসিক উৎকর্ষ সাধনে এগুলোর বিকল্প নেই। এসব নিয়মিত হতে থাকলে অবশ্যই তা বিজ্ঞ আইনজীবিদের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। যার প্রভাব পড়বে সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থার উপরে।

৮) যথাযথ এ্যাডভোকেসী

বিচারক স্বল্পতার কারণে বিচারকার্য বাধাগ্রস্ত হয় সব থেকে বেশি। জেলা বারের পক্ষ থেকে বিচারক স্বল্পতা নিয়ে অনবরত এ্যাডভোকেসী করতে থাকলে পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটতে পারে। পুণরায় একথা বলা চলে যে, মানবাধিকার আইনজীবি পরিষদ বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। তদুপরি এই পরিষদ বিশ্বাস করে যে, একটি সক্রিয় বার নিজেদের সক্রিয়তা এবং দূরদর্শিতা নিয়ে অনেক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারে। ব্রিটিশ তারাও আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যা উদাহরণ হয়ে আছে। একইভাবে সামাজিক নেতৃত্ব গ্রহণের মাধ্যমে অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে এবং জেলা পর্যায়ে একটি সক্রিয় বার-ই পারে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। মানবাধিকার আইনজীবি পরিষদ গাইবান্ধা বারকে ভবিষ্যতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অন্যদের জন্য অনুসরণীয় একটি বার হিসেবে দেখতে চায়।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১

২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ও এই আইনকে কার্যকর করার জন্য ২০১১ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধনী) আইন সংসদে গৃহিত হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে একবার, ২০১২ সালে দু'বার এবং সর্বশেষ ২০১৩ সালের ৫ মে আরও একবার আইনটি সংশোধন করা হয়। এই বিপুল সংখ্যক মামলার তুলনায় ট্রাইব্যুনালে নির্দিষ্ট ও অভিজ্ঞ বিচারকের স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে বিচারপ্রাপ্তি দারুণভাবে বিলম্বিত হচ্ছে। বছর দেড়েক আগে আইন কার্যকরীকরণের উদ্যোগ নেয়া হলেও ইতোমধ্যে দায়েরকৃত আবেদন শুনানিক্রমে নিষ্পত্তির কাজ নানা ধরনের আইনি অস্পষ্টতা, বিভ্রান্তি ও এক শ্রেণীর অসৎ কর্মচারী, কর্মকর্তার অসহযোগিতার কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, যা বিদ্যমান আইনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপন্থী। অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির জন্য আদালতে ও জেলা কমিটিতে এসে দিনের পর দিন ঘুরছেন ভুক্তভোগী অসহায় মানুষ। আবেদন নিষ্পত্তির দীর্ঘসূত্রিতার জন্য সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তাদের।

১৯৭৪ সালে ২৩ মার্চ জাতীয় সংসদে অর্পিত সম্পত্তি আইন রহিত করে ১৯৭৪-এর ৪৫ নং আইন The Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (Repeal) Act 1974(Act XLV of 1974) পাশ হয়। পরবর্তী সময়ে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ বিভিন্ন মামলায় রায় দেন যে ঐ তারিখের পর কোন সম্পত্তিকে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা যাবে না, করলে তা হবে অবৈধ। কিন্তু অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয় অর্পিত সম্পত্তির তালিকা হিসাবে যে সকল গেজেট প্রকাশ করেছে

তাতে দেখা যায়, 'ক' তফসিল-এ উল্লিখিত সম্পত্তির ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ এবং 'খ' তফশীলের প্রায় পুরাটাই ১৯৭৪ সালের ২৩ মার্চ পরবর্তী সময়ে বেআইনিভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এটি ২৩/৩/১৯৭৪-এর আইনের পরিপন্থী এবং সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ বিষয়ে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আপত্তি তোলার পর ইদানীং দেখা যাচ্ছে কোন তারিখ উল্লেখ না করে সম্পত্তির তালিকার গেজেট প্রকাশ করা হচ্ছে। স্থানীয় প্রভাবশালীদের যোগসাজশে এই কাজটি করেছেন ভূমি প্রশাসনের এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী। 'ক' ও 'খ' তফসিলের গেজেট অসংখ্য ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্যে ভরা। কিছু দূর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তার এই দুরভিসন্ধিমূলক কাজের পূর্ণ তদন্ত আমরা দাবি করছি।

ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে অর্পিত সম্পত্তির যে হিসাব শুরুতে দেয়া হয়েছিল তাতে ছিল, 'ক' তফসিলভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ২১৪.১৪ একর আর 'খ' তফসিলভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ৯২২.৭৬ একর। অথচ এখন তারা যে সম্পত্তি গেজেট তালিকাভুক্ত করেছে তার পরিমাণ ভূমি মন্ত্রণালয় প্রদত্ত উক্ত হিসাবের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। ৫ মে ২০১৩-এর সংশোধনী বাতিল না হলে সংখ্যালঘুদের কোন সম্পত্তিই আর অর্পিত তালিকার বাইরে থাকবে না বলে মানুষের আশংকা। শুধু তাই নয়, বিশেষভাবে এই সংশোধনীর কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই সংশোধনীর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। অর্পিত সম্পত্তি গ্রাসের অসৎ উদ্দেশ্যে বিগত ৪ যুগের এ সংকট জিইয়ে রাখার জন্য এক শ্রেণীর আমলা-কর্মচারী দৃশত: তৎপর। একদিকে প্রতিকারপ্রার্থী জনগণের কাছে ৬১ জেলার (পার্বত্য তিন জেলা বাদে) সব উপজেলায় নির্ধারিত সময়ে গেজেট পৌঁছেনি, পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়ে যাতে প্রতিকারপ্রার্থী জনগণ আবেদন করতে না পারেন তার জন্যে সংশ্লিষ্ট ভূমি দপ্তর নানান অছিলায় প্রয়োজনীয় দলিলাদি সরবরাহে অহেতুক গড়িমসি করছে, মোটা অংকের ঘুষ আদায় করছে।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের ক্ষেত্রে সুপারিশ

ক. 'খ' তফসিল ১৯৭৪ সালের ৪৫ নং আইনের পরিপন্থী এবং সুপ্রীম কোর্টের রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধ বিধায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ এর ২(খ) ও ৯(১) ধারা অনুসারে প্রকাশিত 'খ' তফসিল পুরোটাই বাতিল করতে হবে।

খ. সুপ্রিম কোর্টের রায় অমান্য করে ২৩/৩/১৯৭৪ এর পরেও তালিকাভুক্ত যে সকল সম্পত্তি 'ক' তফসিলের গেজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা গেজেট থেকে বাদ দিতে হবে।

গ. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ এর ধারা ৯(৬) ধারা লংঘন করে 'ক' ও 'খ' তফসীলের সংশোধিত তালিকা প্রকাশের নামে নতুন করে যে সকল সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তা অবৈধ বিধায় বাতিল করতে হবে।

ঘ. ০৫/০৫/২০১৩ তারিখে সংশোধনী আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী মূল আইনের ধারা ৯(১) এর পরে ৯(১ক) ধারা সংযোজনের মাধ্যমে নতুন করে 'ক' ও 'খ' তফসিল এর সংশোধনী প্রকাশের সময়সীমা বেআইনী বিধায় এ সংশোধনী বাতিল করতে হবে।

ঙ. সেই সাথে ভুক্তভোগীরা যাতে সকল কাগজপত্র সংগ্রহ করে সঠিকভাবে ট্রাইব্যুনালে বা জেলা কমিটিতে আবেদন করতে পারে তার জন্য যাদের আবেদনের সময়সীমা ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের জন্য আরও ৩০০ দিন বাড়াতে হবে এবং ভূমি প্রশাসনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারীকে ভুক্তভোগীদের দ্রুত বৈধ সহযোগিতা প্রদানের নির্দেশ জারি করতে হবে।

চ. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ এর ধারা অনুসারে Abatement এর যে বিধান রয়েছে এর মাধ্যমে পূর্বে কোন দেওয়ানী আদালত বা রাজস্ব আদালত থেকে যারা সম্পত্তি ফেরত পাবার জন্য ডিক্রী রায় পেয়েছেন কিন্তু তার বিরুদ্ধে আপীল বা রিভিশন চলমান আছে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এজন্য একটি সংশোধনীর মাধ্যমে পূর্বে যারা কোন দেওয়ানী আদালত বা রাজস্ব আদালত থেকে সম্পত্তি ফেরত পাবার জন্য

ডিক্রী বা রায় পেয়েছেন বা উচ্চতর আদালতে আপীল বা রিভিশন চলমান আছে সেক্ষেত্রে এ আইনের ১৩ ধারা প্রযোজ্য হবে না মর্মে বিধান সংযুক্ত করতে হবে।

ছ. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাশ করা হয়েছে যারা এই আইনের ফলে প্রকৃত ভুক্তভোগী ও সহ-অংশীদার তাদেরকে তাদের সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার জন্য এ সম্পত্তি সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেয়া এ আইনের উদ্দেশ্য নয়। এ উদ্দেশ্যে মর্মকথাটি মাথায় রেখে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত জেলা কমিটি এবং অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনালসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে পরিপত্র জারি করার দাবি জানাচ্ছি।

জ. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আবেদন নিষ্পত্তির জন্য যেসব ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে তাকে আরও সক্রিয় ও সচল করতে হবে। মামলার সংখ্যা অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ ও সার্বক্ষণিক বিচারক নিয়োগ দিতে হবে, তাদের বিচারিক দায়িত্ব ও সময় নির্দিষ্ট করে দিয়ে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

ঝ. প্রয়োজনীয় দলিল, খতিয়ান ও সনদপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ভূমি অফিস কর্তৃক প্রতিকারপ্রার্থী জনগণকে হয়রানী অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ঘুষ, দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

বিচারে দরিদ্র মানুষের প্রবেশাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগ-মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ২৭ ধারায় বলা হয়েছে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। বঞ্চনার শিকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ন্যায় বিচার প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিচ্ছিন্নভাবে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের এসব সমস্যা দূর করতেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আইনগত সহায়তা প্রদান আইন-২০০০ প্রণীত হয়েছে। যার লক্ষ্য হলো আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ ব্যক্তিগণের আইনী অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। দরিদ্র মানুষের আইনি অধিকার রক্ষায়/প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশে কাজ করছে অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আইনী সহায়তা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়াগত বিষয়। সেক্ষেত্রে বেসরকারি সংগঠনগুলোর পক্ষে সব সময়ই আইনি সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন-২০০০ এর বিধিমতে গঠিত জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

যেভাবে শুরু

যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র কানাডাসহ বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশে সরকারি খরচে আইনি সহায়তার পদ্ধতি চালু আছে। রাষ্টের শতভাগ মানুষ যাতে আদালতের কাছে প্রতিকার চাইতে পারে, সেজন্য এই ব্যবস্থা রাখা হয়। জাতিসংঘ ঘোষিত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদে (আইসিসিপিআর) বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি আইনের বা আদালতে আশ্রয় নিতে চান অথচ তার আর্থিক সামর্থ্য নেই, তবে ওই ব্যক্তিকে আইনগত সহায়তা দেয়ার জন্য সরকার বাধ্য থাকবে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা আছে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী। ফৌজদারি ও দেওয়ানি কার্যবিধিতেও সরকারি ব্যয়ে আইনি সেবা সরকারিভাবে দেয়ার বিধান রয়েছে। তারপরও স্বাধীনতার তিন দশক ধরে দেশে সরকারি খরচে আইনি সহায়তার কোনা কার্যক্রম ছিল না।

২০০০ সালের ২৮ এপ্রিল জাতীয় সংসদে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন পাস হওয়ার পর ২০০১ সালে সরকার জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু জনবল ও বিধিবদ্ধ কাঠামোর অভাবে পরের আট বছর

আইনগত সহায়তার মামলা নিস্পত্তির মাসিক প্রতিবেদন(জানুয়ারি-অক্টোবর-১৫পর্যন্ত)

মামলার ধরণ	মোট মামলার সংখ্যা	রায়	ডিসচার্জ অব্যাহতি	এডিআর/ সালিশ	ডিফেল্ট / অনুপস্থিতি	আদালতের বাহিরে নিস্পত্তি	লিগ্যাল এইড বাতিল	অন্যান্য	নিস্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা	মাস শেষে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা
ফৌজদারী	২৫৫৩	৩৮	-	-	-	-	০৬	-	৪৪	২৩০৭
দেওয়ানী	৪৪১	০৫	-	-	-	০১	০৪	-	১০	৪৩১
পারিবারিক	১২১০	৩৫	-	-	-	-	০২	-	৩৭	১১৬৪
অন্যান্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	৪১৯৪	৭৮	-	-	-	-	১২	-	৯১	৩৯০৬

আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন (জানুয়ারি-নভেম্বর-২০১৫)

আবেদনের ধরণ	দাখিলী আবেদনের সংখ্যা			আবেদন প্রাপ্তির উৎস				অনুমোদিত আবেদনের সংখ্যা		
	নারী	পুরুষ	মোট	সরাসরি	আদালত	কারাগার	এনজিও	নারী	পুরুষ	মোট
ফৌজদারী	১২৫	১৫৯	২৮৮	১৭০	-	১১৪	-	১১৯	১৫৮	২৭৭
দেওয়ানী	০৮	২২	৩০	৩০	-	-	-	০৭	১৫	২২
পারিবারিক	৮১	০৩	৮৪	৮৪	-	-	-	৭৯	০৩	৮২
অন্যান্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	২১৪	১৮৪	৪০২	২৮৪	-	১১৪	-	২০৬	১৭৬	৩৮১

আশাব্যঞ্জক যে ২০১১ সালের সরকারি নির্দেশনার পর গাইবান্ধা জেলায় ১৪ জন সদস্য সমন্বয়ে ৭টি উপজেলায় এবং ইউনিয়ন কমিটিতে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানসহ ১৪ জন সদস্য সমন্বয়ে ৮২ টি ইউনিয়ন কমিটি (সকল) গঠিত হয়েছে। তবে জেলায় সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হলেও সকল কমিটির নিয়মিত সভা ও কার্যক্রম চালু হয় নাই এবং এ সকল এলাকায় তৃণমূল মানুষ এখনও কমিটির কাছে অথবা কমিটি তৃণমূল মানুষের কাছে পৌছাতে পারে নাই।গাইবান্ধা জেলায় ৭৮ জন প্যানেল আইনজীবী রয়েছেন যারা লিগ্যাল এইড মামলায় সহযোগিতা করে থাকেন। তবে লিগ্যাল এইডের মামলা পরিচালনা বিষয়ে দরিদ্র বিচার প্রার্থীরা নানা ধরনের অসুবিধার/সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। যেমন:

১. যে আইনজীবী বিচারপ্রার্থীর মামলা পরিচালনা করছেন তার সাথে সুষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠছে না অথবা কোন আইনজীবী মামলা পরিচালনা করেছে তা বিচারপ্রার্থী সময় মত জানতে পারছেন না।

২. প্রায় সময়ই বিচারপ্রার্থীর পছন্দের আইনজীবীকে আইন সহায়তাকারী হিসাবে পাচ্ছেন না।

৩. মাঝে মাঝে বিচার প্রার্থীদের কাছ থেকে আর্থিক চাহিদার অভিযোগ পাওয়া যায়।

৪. কিছুদিন মামলা পরিচালনা করার পর আইনজীবী পরিবর্তনের জন্য বিচার প্রার্থীরা আবেদন করে থাকেন।

৫. কোন কোন প্যানেল আইনজীবী তাদের নির্ধারিত মামলার মাসিক প্রতিবেন দাখিল করেন না।

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের সাফল্য নির্ভর করছে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা ও জনমত সৃষ্টির ওপর। দেশের জনগণের বিরাট একটি অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এছাড়া বিপুল সংখ্যক মানুষ নিরক্ষর। দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগণ তাদের আইনগত অধিকার সম্পর্কে মোটেও সচেতন নয়। এসব মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হলে অথবা তারা কোন আইনি জটিলতায় পতিত হলে আর্থিক দৈন্য কিংবা দরিদ্রতার কারণে তারা আদালতের আশ্রয় নিতে পারেন না। দেশের জনসাধারণকে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালের ২৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০

কার্যকরের তারিখ অর্থাৎ ২৮ এপ্রিলকে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ঘোষণা করার পর থেকে সারাদেশে সরকারিভাবে দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর ২৮ এপ্রিল গাইবান্ধা জেলাতেও 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি সংগঠন গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০১৫-এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'সরকারি আইনি সহায়তা পাওয়ার উন্মুক্ত হলো দ্বার-বিকল্প বিরোধী নিষ্পত্তি সংযুক্ত হলো এবার'। এই দিবস উপলক্ষ্যে জেলায় র‍্যালি, মাইকিং, রক্তদান কর্মসূচি, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

এ আইন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা/সমস্যা

১. আবেদনকারীর আবেদনের ভিত্তিতে নিয়মিত মাসিক সভায় আবেদন গ্রহণ ও আইনজীবী নিয়োগ করা হলেও, মামলা ফাইল করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা না থাকায় মামলায় দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়।

২. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার জেলা কমিটি আইনী সহায়তার জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও গ্রহণ এবং আইনজীবী নিয়োগ করে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে মামলা নিয়মিতভাবে ফলো-আপের কোন ব্যবস্থা নেই।

৩. জাতীয় আইন সহায়তা আইন-২০০০ এর ২(ক) ধারায় 'আইনগত সহায়তা' অর্থ আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়- সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীকে আইনগত পরামর্শ প্রদান, আইনজীবীর ফিস প্রদান ও মামলার খরচ প্রদানসহ অন্য যে কোন সহায়তা প্রদানকে বুঝায়। কিন্তু মামলার খরচ প্রদানসহ অন্য যে কোন সহায়তা বলতে কি বুঝানো হচ্ছে তার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই।

৪. জেলা পর্যায়ে সরকারি আইন সহায়তা তহবিলের মাধ্যমে দায়েরকৃত মামলাসমূহের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কোন মনিটরিং সেল নেই।

৫. এ আইনের মাধ্যমে বিচার প্রার্থীর পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া সত্ত্বেও, আর্থিক অসামর্থ্যতার কারণে একজন দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে মামলার তারিখে তারিখে হাজিরা প্রদান, স্বাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না বিধায়, একটা সময়ে এসে মামলাগুলো স্থবির হয়ে যায় এবং দরিদ্র মানুষের বিচার প্রাপ্তি অর্থাৎ আইনটির মূল উদ্দেশ্য হয় বাধাগ্রস্ত।

৬. জেলা পর্যায়ে জেলা কমিটি এবং আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার অফিস কক্ষ আছে। কিন্তু সুর্নির্দিষ্ট ষ্টাফ না থাকায় মামলাগুলোর বর্তমান অবস্থার তথ্য জানা যায় না। এছাড়াও মামলা চলাকালীন বিচারপ্রার্থীর সাথে আইনজীবীর মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে; যেমন: মামলার তারিখ, স্বাক্ষী, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ ইত্যাদি বিয়য়ে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নেই। এ কারণে মামলা পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটে এবং নিঃস্ব মানুষটি আরো নিঃস্ব হয়ে যায়।

৭. সরকারি আইনগত সহায়তা তহবিলের (লিগ্যাল এইড) মামলা পরিচালনায় আইনজীবীর সম্মানী তুলনামূলকভাবে খুবই কম।

৮. এ আইনে একজন অসচ্ছল ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে পরিমাণ বার্ষিক গড় আয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা বর্তমান সময়ে নিতান্তই অবাস্তব।

৯. ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটি এখনও তেমন সক্রিয় নয় এবং তারা মামলার আবেদন পাঠায় না।

১০. আইনটি এখনও সাধারণ্যে তেমন পরিচিতি লাভ করেনি।

সুপারিশ

১. উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আইনটির ব্যাপারে প্রচারণা চালানো। এ ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে প্রচারণার জন্য বিভিন্ন

কার্যক্রম গ্রহণ। এ কাজের জন্য সিংহভাগ অর্থের যোগান দিতে পারে লিগ্যাল এইড, জেলা কমিটি (আইন সহায়তা তহবিল থেকে)।

২. ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার সদস্যদের এই আইন সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান।

৩. যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দরিদ্র মানুষের আইনি সহায়তা নিয়ে কাজ করছে, তাদের আরো বেশী মাত্রায় কমিটির কাজের সাথে জড়িত করা।

৪. আইনজীবী নিয়োগের পর মামলা ফাইল করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৫. কমিটির মাসিক সভায়, পূর্বের মামলার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট উপস্থাপন এবং এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানকে মামলার ফলোআপ করার জন্য দায়িত্ব প্রদান।

৬. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত মামলাগুলোর মনিটরিং ও ফলোআপের জন্য জেলা বারের সদস্যদের সমন্বয়ে একটি মনিটরিং ও ফলোআপ কমিটি গঠন এবং জেলা বারের পক্ষ থেকে বার ভবনে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার সেবা সম্পর্কে একটি তথ্য কেন্দ্র চালু করা যেতে পারে।

৭. বিশেষত্ব অনুযায়ী প্যানেল আইনজীবীদের তালিকা বোর্ডে উপস্থাপন।

৮. কাগজপত্র-দলিলাদি সংগ্রহ, বিচারপ্রার্থীর কোর্টে আসা-যাওয়া, সাক্ষীর যাতায়াত ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে। এ রকম বরাদ্দ বিচারে দরিদ্র মানুষের প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে একটা বিরাট সুযোগের সৃষ্টি করবে। যা জাতীয় ও আর্ন্তজাতিকভাবে প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ হতে পারে।

৯. ইউনিয়ন পর্যায়ে ফরম পূরণে সহযোগিতা ও মামলার সত্যতা যাচাইয়ের একটা প্রক্রিয়া তৈরী করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আইনে বর্ণিত আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি সক্রিয় করা যেতে পারে। সেখান থেকে যাতে তৃণমূলে থাকা দরিদ্র বিচারপ্রার্থী তাদের দায়েরকৃত মামলার তারিখ, নিয়োগকৃত আইনজীবীর নাম, সমন ও মামলার বর্তমান অবস্থা তথা লিগ্যাল এইড সংক্রান্ত তথ্যাদি পেতে পারে।

১০. আইনজীবীদের এ ফান্ড ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য কমিটির উদ্যোগে আইনজীবীদের সাথে কর্মশালা/ সেমিনার/মতবিনিময় সভার আয়োজন করা। এছাড়া ও এ আইনের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার/প্রশাসন/সুশীল সমাজ/সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে মতবিনিময় করা যেতে পারে।

১১. মামলা চলাকালীন বিচারপ্রার্থীর সাথে আইনজীবীর মামলা সংক্রান্ত; যেমনঃ মামলার তারিখ, স্বাক্ষী, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে যোগাযোগের একটি প্রক্রিয়া চালু করা প্রয়োজন।

১২. প্যানেল আইনজীবীর সমস্যা/সীমাবদ্ধতা উত্তরণে দ্বি-মাসিকভাবে সভা করার ব্যবস্থা করা এবং গেজেটে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা।

১৩. প্যানেল আইনজীবীদের সাথে জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির নিয়মিত বৈঠকের ব্যবস্থা করা।

১৪. সরকারি আইনগত সহায়তা তহবিলের (লিগ্যাল এইড) মামলা পরিচালনায় আইনজীবী সম্মানী বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সব নাগরিককে নীতিগতভাবে আইনের দৃষ্টিতে সমান বলা হলেও সামাজিক বৈষম্য ও আর্থিক অসঙ্গতি মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি করে, যার একদিকে রয়েছে ধনী, অন্যদিকে দরিদ্ররা। ধনী ও সচ্ছল মানুষের পক্ষে আইনের আশ্রয় লাভ করা যতটুকু সহজ, দরিদ্র মানুষের পক্ষে ততটা সহজ নয়। ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য দূর করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ন্যায় বিচারে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী লিগ্যাল এইড ব্যবস্থা। লিগ্যাল এইড ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে ধনী দরিদ্র বৈষম্য দূর হয়, অন্যায়-অবিচার থেকে দুর্বলরা নিষ্কৃতি পায় এবং সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। অসহায়, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের ন্যায় বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তাই লিগ্যাল এইড ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। আইনগত সহায়তাকে এতদিন রাষ্ট্রের দান বা বদান্যতা মনে করা হলেও আধুনিককালে এ ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। গরীব-দুঃখী মানুষকে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনি সহায়তা প্রদান করা এখন আর করুণা বা বদান্যতা নয়, বরং এটি নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের এক অপরিহার্য দায়িত্ব।

মানবাধিকার ফোরাম, গাইবান্ধা
সদস্যগণের নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	সংগঠন ও পেশা	মোবাইল নম্বর	ছবি
০১	এম. আবদুস্ সালাম	সমম্বয়ক	নির্বাহী প্রধান গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)	০১৭১৩২০০৩৭১	
০২	আবু জাফর সাবু	আহবায়ক	সাধারণ সম্পাদক গাইবান্ধা প্রেসক্লাব	০১৭১৬০৫৬১৫১	
০৩	আফতাব হোসেন	সদস্য সচিব	তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)	০১৭১৩৪৮৪৬৪৭	
০৪	আঞ্জুম নাহীদ চৌধুরী	সদস্য	পরিচালক গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)	০১৭১৩৪৮৪৬০০	
০৫	জহুরুল কাইয়ুম	সদস্য	উপাধ্যক্ষ সাদুল্লাপুর ডিগ্রী কলেজ	০১৮১৮৩০০৩৬৩২	
০৬	এ্যাড. আবুল কাশেম	সদস্য	সাধারণ সম্পাদক মানবাধিকার আইনজীবী পরিষদ	০১৭১৪৫১২১৩৫	
০৭	দীপক কুমার পাল	সদস্য	সম্পাদক, দৈনিক জনসংকেত ও সমম্বয়ক HRCBM, গাইবান্ধা জেলা	০১৭১৬৪১১৯০৭	
০৮	এ্যাড. আনিস মোস্তফা তোতন	সদস্য	আইনজীবী গাইবান্ধা জেলা বার	০১৭১২৯৩৯৭৩৫	
০৯	সৈয়দ আজহারুল হক লালু	সদস্য	টীম লিডার জেলা মুক্ত রোভার স্কাউট	০১৭১২২৫৬৪৪৩	
১০	কাজী আব্দুল খালেক	সদস্য	সভাপতি, বাদিয়াখালী মানবাধিকার সংরক্ষণ পরিষদ	০১৭১৩৩৯৪২১৪	
১১	প্রবীর চক্রবর্তী	সদস্য	নির্বাহী পরিচালক অবলম্বন	০১৭১৮৭৩৮৪৬১	
১২	আঃ মতিন সরকার	সদস্য	উন্নয়ন কর্মী এসডিআরএস	০১৭১৮১৯২০৭৭	
১৩	হাসিনা জোয়াদ্দার	সদস্য	সভাপতি, উপজেলা মানবাধিকার নারী সমাজ	০১৭৪৪৫৪২১৭৪	

সদস্যগণের নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	সংগঠন ও পেশা	মোবাইল নম্বর	ছবি
১৪	চান্দু মিয়া	সদস্য	সভাপতি, উপজেলা মানবাধিকার সংরক্ষণ পরিষদ	০১৭৪৫৬২৬৭৯২	
১৫	মোদাচ্ছেরুজ্জামান মিলু	সদস্য	উন্নয়ন ও মানবাধিকার কর্মী এসকেএস ফাউন্ডেশন	০১৭১৩৪৮৪৪২২	
১৬	মিনু রানী মহন্ত	সদস্য	সভাপতি, রামচন্দ্রপুর মানবাধিকার সংরক্ষণ পরিষদ	০১৭২৫২৪৩৫৬৩	
১৭	আফরোজা লুনা	সদস্য	জেলা প্রতিনিধি একুশে টিভি	০১৭৪০৬২৭৬৭৭	
১৮	ডাঃ আনিছুর রহমান রঞ্জু	সদস্য	সাধারণ সম্পাদক রামচন্দ্রপুর মানবাধিকার সংরক্ষণ পরিষদ	০১৭১৯৫০৯৫৮০	
১৯	আঃ রহমান আকন্দ	সদস্য	সহ-সভাপতি, সাহাপাড়া মানবাধিকার সংরক্ষণ পরিষদ	০১৭৫১৩৯৮৩৪৬	
২০	শামীম আল সাম্য	সদস্য	জেলা প্রতিনিধি একাত্তর টিভি	০১১৯৯৩৯৬৯৫৮	
২১	আলমগীর হোসেন	সদস্য	সভাপতি মানবাধিকার নাট্য পরিষদ	০১৭১৩৬৩৬৫৯১	
২২	আরিফুল ইসলাম বাবু	সদস্য	সদস্য সচিব, জেলা নাগরিক পরিষদ ও জেলা প্রতিনিধি, ইন্ডিপেনডেন্ট টিভি	০১৭১২১৬৬৩২৪	
২৩	শাহিদা বেগম	সদস্য	সহ-সভাপতি, কমিউনিটি পুলিশিং ফোরাম, রামচন্দ্রপুর	০১৭১৭৯৫৪১১৩	
২৪	শহিদুল ইসলাম	সদস্য	প্রতিবন্ধী সংগঠন ল্যাম গ্রুপ গাইবান্ধা	০১৭২৪১০৬৩২৭	
২৫	মোঃ আব্দুর রশিদ	সদস্য	প্রতিবন্ধী সংগঠন ল্যাম গ্রুপ গাইবান্ধা	০১৭২৪০৬৯৪৫১	

মানবাধিকার ফোরাম, গাইবান্ধা সচিবালয়

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)

নশরৎপুর, গাইবান্ধা-৫৭০০

পোস্ট বক্স-১৪, বাংলাদেশ।

ফোন ও ফ্যাক্স : +৮৮ ০৫৪১-৮৯০৪২

মোবাইল : +৮৮ ০১৭১৩-৪৮৪৬৪৭

ইমেইল : info@gukbd.net

ওয়েব সাইট : www.gukbd.net

ফেসবুক : www.facebook.com/gukgaibandha